কপোট্রনিক সুখদুঃখ
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

কপোট্রনিক ভালবাসা

আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুটি রিসার্চ সেন্টারের করিডোরে আমাকে গুলি করেছিল। স্পষ্টতই সে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু যে-কারণেই হোক, আমি মরি নি এবং কে আমাকে গুলি করেছিল সেটা এখন পর্যন্ত বাইরের কেউই জানে না। আমার বাম ফুসফুসটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল এবং এজন্যে আমাকে পুরো তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছে। এই সুদীর্ঘ তিন মাস আমি যেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছি, আমার গবেষণার সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি মানুষের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, বেঁচে থাকার প্রেরণা, আনন্দ ও যন্ত্রণার যৌক্তিকতা নিয়ে ভেবেছি। হাসপাতালের নিঃসঙ্গ পরিবেশ বা আমার অসুস্থ অবস্থার জন্যই হোক, আমি পরিপূর্ণভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করছিলাম। ঠিক এই সময়ে আমার সেই বন্ধুটি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। সে ভীষণ শীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তার চোখের কোণে কালি, মুখে অপরাধবোধের ছাপ।

তুমি পুলিশকে আমার নাম বলতে পারতে—সে ঠিক এই কথাটি দিয়ে শুরু করেছিল—বল নি দেখে ধন্যবাদ। তবে যদি ভেবে থাক এটা তোমার মহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব দিয়ে তুমি আমার উপর প্রভুত্ব করবে, তা হলে খুব ভুল করছ।

আমি তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, তুমি কী জন্যে আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে সেটা না জানলে হয়তো তোমাকে আমি ঘৃণা করতাম না। কিন্তু এখন তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

সে আমার এই কথাটায় বিচলিত হয়ে পড়েছিল। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম, হয় সে, নাহয় আমি বেঁচে থাকব। একজন অন্যজনকে ঘৃণা করতে করতে পাশাপাশি বেঁচে থাকতে পারে না। পরের দিনই আমি খবর পেয়েছিলাম আমার বন্ধুটি গুলি করে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। আমি জানতাম তার অনুভূতি চড়া সুরে বাঁধা, কিন্তু এতটা ধারণা করি নি।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকের চাকরিটি ছেড়ে দিলাম। আমার বয়স তখন মাত্র চব্বিশ বছর, আর সে-বছর থেকেই পায়োনের সাব-

স্ট্রাকচারের মডেলটি আমার নামে পরিচিত হতে লাগল। এই মডেলটি আমার চিন্তাপ্রসূত এবং আমার মৃত বন্ধুটির এটির প্রতি মোহ জন্মেছিল।

সবরকম আকর্ষণ থেকে ছাড়া পাওয়া আমার পক্ষে যথেষ্ট কঠিন হয়েছিল। এর জন্য আমাকে যথেষ্ট নির্মম ও বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। কিন্তু আমি কিছুতেই বাইরের জগতের জন্য আকর্ষণ জাগাতে পারছিলাম না। আমি নিজের ভিতরে একটি আলাদা ভাবনার জগৎ গড়ে তুলেছিলাম, আমার সেখানে ডুবে থাকতেই ভালো লাগছিল।

যে-মেয়েটি আমাকে দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করত, ক্রমে ক্রমে সেও আমার অসহ্য হয়ে উঠল। তাকে বিদায় করার পর আমার দৈনন্দিন কাজে নানারকম বিঘ্ন ঘটতে লাগল। আমার সারা দিনের রুটিন ছিল খুব সাদাসিধে। আমি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোতাম। ঘুম থেকে উঠে সারা দিন ছবি আঁকতাম। রাত্রিবেলা আমি দর্শন ও মধ্যযুগীয় চিরায়ত সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করতাম। আমি কারো সাথে দেখা করতাম না। সপ্তাহে এক দিন লেটার-বক্স থেকে চিঠিগুলি এনে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। ফোনটার তার কেটে দিয়েছিলাম বহু আগেই। আমার এই সহজ জীবনযাত্রায় শুধু দু'বেলার খাবার ও একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ঝামেলাটুকুও অসহনীয় হয়ে উঠল। এজন্যে একজন সাহায্যকারী রাখতেই হয়। আমি গৃহকর্মে পারদর্শী একটা রবোট* কিনব কি না ভাবছিলাম। কিন্তু আমার ঘরে ভাবলেশহীন একটা যন্ত্রদানব ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভোরে আমার কফি তৈরি করে দিচ্ছে, কাপড় ইস্ত্রি করছে—এটা ভাবতেই আমার মন বিরূপ হয়ে উঠল। আমার ইচ্ছে করছিল একটা সংবেদনশীল রবোটের সাহচর্য পেতে। কিন্তু পৃথিবীতে অনুভূতিসম্পন্ন রবোট এখনো তৈরি হয় নি। আমি প্রায় হঠাৎ করে ঠিক করলাম, একটা অনুভূতিসম্পন্ন রবোট আমি নিজেই তৈরি করব—সম্পূর্ণ আমার মনোমতো করে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আমার জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে গেল। আমার বেশিরভাগ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত থাকত রবোটের নক্সা ও খুঁটিনাটি বিষয়ে। পরিশ্রম করতে শুরু করার পর একটা মেয়েকে কাজে সাহায্য করতে রাখার বিরক্তিটাও তত বেশি মনে হল না।

সাধারণ রবোট তৈরি এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। রবোটের মস্তিষ্ক—যেটাকে সাধারণভাবে কপোট্রন বলা হয়ে থাকে, সেটা যে-কোনো ফার্ম থেকেই অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু আমার রবোটটির জন্যে ঠিক কী ধরনের কপোট্রন প্রয়োজন বুঝতে পারছিলাম না। বি-এফ-২ ধরনের কপোট্রন গৃহস্থালি কাজের জন্যে ব্যবহার করা হয়। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে যেসব রবোট ব্যবহার করা হয়, তাদের কপোট্রন এল. ২. বি.টাইপের। আমাদের বিদ্যালয়ের বিতটনটির ভার দেয়া ছিল এল. এ. এফ. টাইপের কপোট্রনযুক্ত রবোটকে।

আমি যে রবোটটি তৈরি করতে যাচ্ছি, সেটাতে এগুলোর কোনোটিই থাকবে না, কারণ এ সবগুলিই বিভিন্ন যান্ত্রিক বিষয়ে অভিজ্ঞ। সংবেদনশীলতা বা যেটাকে আমরা অনুভূতি বলে থাকি, সেটা এগুলোর কোনোটিতেই নেই। সংগীতে অবশ্যি গাণিতিক

---

*Robot : যন্ত্রমানব

রবোটের বি. কে. ২১ কপেট্রন ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু সেসব রবোট গাণিতিক বিশ্লেষণ করে সুর সৃষ্টি করলেও সুরকে অনুভব করতে পারে না। কারণ অনুভূতি বলে যে–মানবিক প্রক্রিয়াটি আছে, সেটা এখন পর্যন্ত মানুষের একচেটিয়া। আমি এমন একটি রবোট সৃষ্টি করতে চাইছি, যেটা গান শুনতে ভালবাসবে, কবিতা পড়বে, হাসবে, এমন কি দুঃখ পেলে কাঁদবে। আনন্দ, বেদনা, ঈর্ষা বা রাগ—এ সব কয়টি মানবিক অনুভূতি যান্ত্রিক উপায়ে তৈরি করা যায় কি না আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।

ফার্মগুলোর ক্যাটালগে আমার মনোমতো কপোট্রন পাওয়া গেল না। একটি ফার্ম অবশ্যি ঘোষণা করেছে, হাসতে পারবে এমন একটি কপেট্রন তারা শীঘ্রই প্রদর্শন করবে। তাদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, শীঘ্রই বলতে তারা আরও চার বছর পরে বোঝাচ্ছে। তারা দুঃখ করে লিখেছে, অনুভূতিসম্পন্ন রবোট তৈরির পরিকল্পনা সরকার অনুমোদন করতে চাইছে না, কারণ এটার কোনো ব্যবহারিক গুরুত্ব নেই।

আমি একটি দেশীয় ফার্মকে অর্ডার দিয়ে একটি সাধারণ বি–১ ধরনের কপেট্রন তৈরি করালাম। এটির নিউকেপটিত সেলের সংখ্যা সাধারণ কপেট্রনের চার গুণ, মানুষের নিউরোন সেলের প্রায় অর্ধেকসংখ্যক। তবে এটির কোনোরকম যান্ত্রিক দক্ষতা নেই। আমাকে কপেট্রনটি হস্তান্তরের সময় ডিরেক্টর ভদ্রলোক এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

কপেট্রনটিকে বিভিন্ন অংশের সাথে সংযুক্ত করে রবোটের আকৃতি দিতে আমাকে প্রায় রবোটের মতোই খাটতে হল। পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকায় আমার সময়ও লাগল অনেক বেশি। সৌভাগ্যক্রমে আমি আমার সব বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। আমাকে এই ছেলেমানুষি কাজে এরকম সময় নষ্ট করতে দেখলে তাদের বিরক্তির অবধি থাকত না।

রবোটটি শেষ করার পর তার চেহারা দেখে আমার তাক লেগে গেল। রবোট তৈরির প্রথম যুগে যেরকম অতিকায় রবোট তৈরি করা হত, এটা হয়েছে অনেকটা সেরকম। অতিকায় মাথা, ঠিক মানুষের চোখের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দু'টি সবুজাভ চোখ—যদিও সব রবোটেই একটিমাত্র চোখ থাকে, আমি দু'টি না দিয়ে পারি নি। মুখের জায়গায় স্পিকার। নাক ছাড়া খারাপ লাগছিল দেখে একটা কৃত্রিম গ্রিক ধাঁচের নাক স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়েছি। চতুষ্কোণ শরীরের দু' পাশে ঝুলে থাকা হাত, হাতে মোটা মোটা ধাতব আঙুল। দুটো থামের মতো শক্ত পা, হাঁটুর জায়গায় জটিল যান্ত্রিক জোড়। পায়ের পাতা বিরাট বড়, গোলাকৃতির, অনেক জায়গা জুড়ে আছে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে। আমি রং করে পায়ের আঙুল, বুকের পেশি, ঠোঁট, কান, চোখের ভুরু, চুল—এসব এঁকে দিলাম। বলতে লজ্জা নেই, তাতে রবোটটির চেহারার উন্নতি না হয়ে কাগতাড়ুয়াদের মতো দেখাতে লাগল।

বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়ার পর রবোটটি চোখ পিটপিট করে ঘুরে দাঁড়াল। তার বুকের ভিতর থেকে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসছিল। সবুজাভ চোখে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে লাগল। আমি বললাম, তোমার নাম প্রমিথিউস।

কথাটি আমি ভেবে বলি নি, কিন্তু রবোটটি মাথা ঝুঁকিয়ে সেটি মেনে নেবার পর

আমার আর কিছু করার ছিল না।

প্রমিথিউসকে আমার দৈনন্দিন কাজের সাথে পরিচিত করে তুলছিলাম। সে সকালে নাস্তা তৈরি করে দিত, ঘর পরিষ্কার করত এবং মাঝে মাঝে কাপড় ইস্ত্রি করে দিত। বলতে দ্বিধা নেই, তার আচার-আচরণ ছিল পুরোপুরি গবেটের মতো। তার সৌন্দর্যবোধের কোনো বালাই ছিল না। ফুলপ্যান্ট ইস্ত্রি করত আড়াআড়িভাবে। একদিন স্বাধীনভাবে ঘর পরিষ্কার করতে দেয়ায় দেয়ালে টাঙানো দুটো অয়েলপেইনটিং ফেলে দিয়েছিল।

যখন প্রমিথিউসের সাথে যথেষ্টভাবে পরিচিত হয়ে উঠলাম, তখন একদিন তার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নিতে বসলাম। সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করে তাকে জীবনানন্দ দাশ নামক জনৈক প্রাচীন বাঙালি কবির লাইন পড়ে শোনালাম,

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে—
জানি না সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা—

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, এই লাইন দুটি সম্পর্কে তোমার কী মত?

'চিন্তায় অসঙ্গত কোনো মানুষের উক্তি।'

তাকে গঁগার আঁকা একটি পলিনেশিয়ান মেয়ের ছবি দেখালে সে অনেকক্ষণ ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে বলল, 'বিকৃত শারীরিক গঠনের একটি মেয়ের ছবিতে দুর্বোধ্য কারণে সব কয়টি রং অনিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

গঁগার শিল্পকীর্তির এ-ধরনের মূল্য বিচারে আমার পক্ষে হাসি চেপে রাখা মুশকিল হল। উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কী করছিলাম?'

'আপনি হাসছিলেন।'

হাসি কি?

এক ধরনের অর্থহীন শারীরিক প্রক্রিয়া।

তুমি হাস তো।

সে আমার হাসিকে অনুকরণ করে যান্ত্রিক শব্দ করল।

প্রমিথিউসকে নিয়ে হতাশ হবার পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু আমি হতাশ হই নি। তার ভিতরে সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করার জন্যে আমি কিছু নতুন সংস্কার করব ঠিক করলাম। সৌন্দর্য নিয়ে আমাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হল। সৌন্দর্যের গাণিতিক বিশ্লেষণ আমাকে এ ব্যাপারে বাস্তব সাহায্য করল।

প্রমিথিউসের ভিতর সৌন্দর্যচেতনা জাগাতে হলে তার ভিতরে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যার জন্যে সে যখনই সুন্দর কিছুর সম্মুখীন হবে, তখনই তার ভালো লাগতে শুরু করবে। সোজাসুজি তাকে ভালো লাগার অনুভূতি দেয়া সম্ভব নয়—তার কষ্ট কমিয়ে দেয়ার অনুভূতি দেয়া যেতে পারে। কষ্ট কমানোর আগে তাকে সবসময়ের জন্যে খানিকটা কষ্ট দিয়ে রাখতে হবে। কপোট্রনের নিউকেপটিভ সেলে একটি অসম বৈদ্যুতিক চাপ দিয়ে রাখলে কপোট্রন তার সবরকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়ে চেষ্টা করবে বৈদ্যুতিক চাপের অসমতাকে দূর করতে। এই অবস্থাটাকে কপোট্রনের কষ্ট বলা যায়।

যখনই বৈদ্যুতিক চাপের অসমতাকে কমানো যাবে, তখনই কষ্ট কমে গিয়ে একটা ভালো লাগার পরোক্ষ অনুভূতি সৃষ্টি হবে। কপেট্রনের সেলগুলির সামনে একটা পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে সহজেই এটা করা যায়। কিন্তু প্রকৃত ঝামেলার সৃষ্টি হবে সুন্দর কিছু দেখা, শোনা বা অনুভব করার সাথে সাথে এই বিদ্যুৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাব পরিবর্তন করার মাঝে। এ জন্যে কপেট্রনের সেলগুলিকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করতে হল। বাইরের জগতের যে-কোনো প্রভাব সেগুলোতে আলাদা আলাদাভাবে ছড়িয়ে পড়ত। সৌন্দর্যের গাণিতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী সেগুলি সুন্দরের আওতাভুক্ত হলেই কপেট্রনের কষ্ট কমতে থাকত—ঘুরিয়ে বলা যায়, কপেট্রনের ভালো লাগা শুরু হত। সৌন্দর্যের তীব্রতা অনুযায়ী সে-ভালো লাগাও কম বা বেশি হতে পারে।

প্রমিথিউসের এই সংস্কার করতে গিয়ে আমাকে পশুর মতো পরিশ্রম করতে হল। দীর্ঘ সময় প্রমিথিউসকে অচল রেখে তার কপেট্রনে অস্ত্র চালাতে হয়েছে। কপেট্রনের এ-ধরনের জটিল কাজ করে সূক্ষ্ম কাজে পারদর্শী আর-২১ ধরনের রবোট। দু' মাস দশ দিন পর আমি যখন প্রমিথিউসের সংস্কার শেষ করলাম, তখন আমার কন্টাক্ট লেন্সের পাওয়ার বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে, ওজন কমেছে চার পাউন্ড। অবিশ্যি এ-কথা স্বীকার না করলেই নয়, ওজন মাত্র চার পাউন্ড কমার পিছনে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব বুলার। বুলা আমার কাজকর্মে সাহায্য করার নূতন মেয়েটি। প্রমিথিউসের সৌন্দর্যচেতনা সৃষ্টির সময় একজন সাহায্যকারীর জন্যে কোম্পানিকে লিখলে তারা এই মেয়েটিকে পাঠায়। আর দশটা মেয়ের মতো সেও ছুটির সময় চাকরি করে অর্থোপার্জন করছে। সামনের জুলাই মাসে সে পদার্থবিদ্যায় অনার্স পরীক্ষা দেবে।

প্রমিথিউসকে আবার জীবনদান করার সময় ঘরটাকে যথাসম্ভব ফাঁকা করে দিলাম। সুইচ টিপে আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হল—নূতন আবিষ্কৃত রডোন টিউবগুলি ভাল্‌বের মতোই গরম হতে সময় নেয়। মিনিট পাঁচেক পরেই প্রমিথিউসের চোখে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে লাগল। প্রমিথিউস তার একটা হাত অল্প উপরে তুলে দ্বিধান্বিতভাবে আবার নামিয়ে ফেলল।

কেমন আছ? আমার প্রশ্নের উত্তর সে সাথে সাথে দিল না। আগে কখনও এরকম করে নি। একটু পরে বলল, ভালো।

আমার ভুলও হতে পারে, কিন্তু মনে হল ওর কথায় যেন আবেগের ছোঁয়া লেগেছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তোমার ভিতরে কোনো পরিবর্তন টের পাচ্ছ?

না তো! কেন?

উত্তর না দিয়ে আমি হাত বাড়িয়ে টেপ রেকর্ডারটি চালিয়ে দিলাম। এহুদি মেনুহিনের বেহালার করুণ সুরে মুহূর্তে সারা ঘর ভরে উঠল। প্রমিথিউস শক্‌ খাওয়ার মতো চমকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি টেপ রেকর্ডারটি বন্ধ করে দিতেই আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, স্যার, বন্ধ করবেন না।

কেন? এটা শুনতে কেমন লাগছে?

প্রমিথিউস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলল, এটা বিভিন্ন

কম্পনের শব্দতরঙ্গের পারস্পরিক সুষম উপস্থাপন। কিন্তু এটা শুনলে আমার ভিতরে এমন একটা বিচিত্র প্রক্রিয়া হতে থাকে যে, ইচ্ছে হয় আরো শুনি, আরো শুনি।

আমি বুঝতে পারলাম, প্রমিথিউসকে তার নূতন অবস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া প্রয়োজন। বললাম, প্রমিথিউস, এহুদি মেনুহিনের বেহালার সুর শুনে তোমার ভিতরে যে–দুর্বোধ্য শারীরিক প্রক্রিয়া হচ্ছিল, সেটির নাম ভালো লাগা। পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র রবোট, যে ভালো লাগা খারাপ লাগার অনুভূতি বুঝতে পারে।

প্রমিথিউস দু'পা সরে এল। যান্ত্রিক মুখে একাগ্রতা, নিষ্ঠা ইত্যাদি ছাপ ফোটানোর পরবর্তী পরিকল্পনা আমার মাথায় উঁকি দিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে তুমি আরো নূতন অনুভূতির সাথে পরিচিত হবে।

কি রকম?

যেমন এই গোলাপ ফুলটি। আমি জানালা খুলে তাকে বাগানের সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ ফুলটি দেখালাম।

স্যার! প্রমিথিউস চেঁচিয়ে উঠল, আমার ভালো লাগছে!

হ্যাঁ। সুন্দর জিনিস দেখলেই তোমার ভালো লাগবে, তবে তা চেঁচিয়ে বলার দরকার নেই। আমি তাকে ফুলটি ছিঁড়ে আনতে বললাম। সে ফুলটিকে ছিঁড়ে এনে চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। আমি তার হাত থেকে ফুলটি নিলাম, নিয়ে হঠাৎ কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললাম!

প্রমিথিউসের ভিতর থেকে আর্তনাদের মতো একটা যান্ত্রিক শব্দ বের হল। আবার আমি বললাম, তোমার এখন আমার প্রতি যে–অনুভূতি হচ্ছে—সেটার নাম রাগ। রাগ বেশি হলে তোমার কপোট্রন তোমার উপর যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে।

প্রমিথিউস কোনো কথা বলল না। স্পষ্টতই ও রাগ হয়েছে।

অর্থহীন কাজ দেখলে রাগ হয়। গোলাপ ফুলটা তোমার ভালো লেগেছে, আমি শুধু ওটা ছিঁড়ে ফেলেছি, তাই তোমার রাগ হয়েছে।

প্রমিথিউস অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, আমার গোলাপ ফুল খুব ভালো লাগে।

খুব ভালো লাগার আর একটি নাম আছে। সেটা হচ্ছে ভালবাসা।

প্রমিথিউস বিড়বিড় করে বলল, আমি গোলাপ ফুল ভালবাসি।

ঠিক সেই সময় বুলা তার একরাশ কালো চুলকে পিছনে সরিয়ে দরজা খুলে ঘরে এসে ঢুকল। বলল, স্যার, আপনার খাবার সময় হয়েছে।

আসছি।

না, এক্ষুনি চলুন, দেরি হলে জুড়িয়ে যাবে। মেয়েটি ছেলেমানুষ, আমাকে না নিয়ে কিছুতেই যাবে না। আপত্তি করব, তার উপায় নেই। কীভাবে জানি আমি তার অনেকটুকু প্রভুত্ব মেনে নিয়েছি।

আমি প্রমিথিউসকে বসিয়ে রেখে মেয়েটির পিছে পিছে খাবার ঘরে গেলাম। যাওয়ার সময় শুনলাম প্রমিথিউস বিড়বিড় করে বলছে, আমি এই মেয়েটিকে ভালবাসি।

প্রমিথিউস কিছুদিনেই একজন বিশুদ্ধ সংস্কৃতিবান রবোটে পরিণত হল। তার প্রিয় কবি জাঁ ককতো। মূল ফরাসি ভাষা থেকে প্রমিথিউসের অনুবাদ করা কবিতাগুলি

ধারাবাহিকভাবে একটি সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। আমি তাকে মৌলিক রচনা করার উৎসাহ দিয়েছি। বর্তমানে সে 'কপেটনিক সংশয়গুচ্ছ' নাম দিয়ে একটি কবিতার বই লিখছে।

কিছুদিনের ভিতরে সে উপন্যাস পড়ায় ঝুঁকল। আমি তাকে গোর্কি শেষ করে কাফকায় ডুবে যেতে দেখলাম। হেমিংওয়ে, সার্ত্রে, কাম্যু পড়ে যেতে লাগল দ্রুত।

বুলা পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রমিথিউস আজকাল বুলার দায়িত্ব পালন করছে। স্পষ্টতই প্রমিথিউস খাবার টেবিলে বুলার মতোই আরেকটু মাংস নিতে পীড়াপীড়ি করে, কিন্তু তবুও বুলার অভাবটা আমার সহজে পূরণ হতে চাইল না। মেয়েটি সুন্দরী ছিল, বুদ্ধিমতী ছিল এবং আমার জন্যে প্রকৃত অর্থে মমতাও ছিল। বুলা চলে যাওয়ার পরপরই আমি বুঝতে পারলাম, আমি বুলাকে ভালবেসেছিলাম। আমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মানবিক এই সমস্ত উচ্ছ্বাসগুলির বিশেষ কোনো মূল্য নেই। কিন্তু যতই বুলার কথা ভুলতে চাইলাম, ততই মস্তিষ্কের কোথাও অসম বৈদ্যুতিক আবেশ হতে থাকল। কাজেই যেদিন বুলা প্রমিথিউসের তত্ত্বাবধানে আমার জীবনযাত্রা কেমন চলছে দেখতে এল, সেদিন আমার আনন্দের অবধি রইল না।

এই যে বুলা! আমি এই শুষ্ক কথা কয়টি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেও কিছুক্ষণের ভিতরেই প্রকৃত বক্তব্যে চলে এলাম। বললাম, তুমি আমার কাছে না এলে আমিই তোমার কাছে যেতাম। অর্থাৎ আমি তোমাকে—আমাকে একটু কাশতেই হল, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বুলা প্রথমে বিস্মিত হল, পরে লাল হয়ে মাথা নিচু করল। আমি একটু দ্বিধা করে বললাম, তোমার আপত্তি থাকলে জানাতে পার। আমি তো আর এমন কোনো মহৎ ব্যক্তি নই, তুমি তো জানই আমার অনেক দোষ-ত্রুটি।

বুলা সহজ হল খুব তাড়াতাড়ি। স্যার বলে সম্বোধন ও আপনি সম্পর্ক থেকে আমার ছোট্ট, প্রায় অজানা ডাকনামটি দিয়ে সম্বোধন করে তুমি সম্পর্ক এত সহজ করে নিল, যে, আমি অবাক হয়ে গেলাম। আরো অবাক হলাম যখন বুলা জানাল তার কুমারীজীবনের স্বপ্নই হচ্ছে আমার এই ছোট্ট ডাকনামটি দিয়ে আমাকে তুমি বলে ডাকবে।

বুলা বিদায় নেবার পর আমার কোনো কাজেই মন বসল না। আমি প্রমিথিউসকে ডেকে পাঠালাম। প্রমিথিউস দু' হাতে কিছু বই নিয়ে হাজির হল। কিছু হ্যাভলক এলিসের লেখা, কিছু ফ্রয়েডের লেখা।

আপনি বলেছিলেন, প্রমিথিউস একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, খুব বেশি ভালো লাগার নাম ভালবাসা। কিন্তু এখানে অন্য কথা লিখেছে। প্রমিথিউস হ্যাভলক এলিসের একটা বই আমার হাতে তুলে দিল। বলল, এখানে লিখেছে ছেলে ও মেয়ের ভিতরে জৈবিক কারণে যে আকর্ষণ হয়, তার নাম ভালবাসা।

আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেলাম। প্রমিথিউসকে তৈরি করার সময় এসব সমস্যা মোটেও ভেবে দেখি নি। আমি বললাম, তোমায় ওভাবে বলেছিলাম, কারণ তুমি এ ছাড়া বুঝবে না। তুমি পৃথিবীর যে-কোনো রবোট থেকে উন্নত, তোমার অনুভূতি আছে; কিন্তু তবুও তুমি সম্পূর্ণ নও। জীবজগতের একটা মূল অনুভূতি—

যৌনচেতনা তোমার নেই।

কেন? প্রমিথিউস দুঃখ পেল। আপনি আমাকে ভালো লাগার, দুঃখ পাবার অনুভূতি দিয়েছেন, তবে এটি দিলেন না কেন?

আমি অল্প উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বললাম, কারণ আছে প্রমিথিউস। প্রাণীদের এ চেতনা আছে, কারণ বংশবৃদ্ধিতে এটা তাদের দরকার। কিন্তু তুমি এটা দিয়ে কী করবে? তুমি কখনোই একটা শিশু রবোট জন্ম দেয়ার জন্যে একটা মেয়ে রবোট পাবে না।

প্রমিথিউস চুপ করে থাকল। বইগুলি টেবিলে রেখে বলল, আপনি আমাকে এই অসম্পূর্ণ অনুভূতি না দিলেও পারতেন। ছেলে আর মেয়েরা এমন কতকগুলি আচরণ করে, তা আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। এতদিনে বুঝতে পারলাম ছেলে আর মেয়ের ভালবাসা কী জিনিস, সেটা অনুভব করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোলাগা বুঝতে পারব, ভালবাসা বুঝতে পারব না।

প্রমিথিউসের জন্যে আমার মায়া হল। আট ফুট উঁচু যন্ত্রদানব সবুজ চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ অনুনয়ের স্বরে বলল, স্যার, আপনি আমায় যৌনচেতনা দিতে পারেন না? দিন না, মাত্র একটি দিনের জন্যে দিন। আমি দেখি ভালবাসা কি!

আমি রাজি হলাম না। প্রমিথিউস মাথা নিচু করে চলে গেল।

আমার আর বুলার বিয়ে হল নভেম্বরে। বিয়ের পরদিনই আমরা হানিমুনে বের হয়ে গেলাম। বাসার যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকল প্রমিথিউসের উপর। দৈব দুর্ঘটনায় বৈদ্যুতিক গোলযোগ ঘটে প্রমিথিউসকে যেন অচল হয়ে থাকতে না হয়, সেজন্যে তার ভিতরে একটা ছোট পারমাণবিক ব্যাটারি সংযোজন করে গেলাম।

আমি আর বুলা ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়ালাম। কখনো পাহাড়ে, কখনো বনে, কখনো-বা সমুদ্রের বালুবেলায়। আমাদের মধু-চন্দ্রিমার দিনগুলি কেটে যেতে লাগল দ্রুত। বাসায় ফিরে যাবার তাগিদ কিছুতেই অনুভব করছিলাম না। মাঝে একদিন ফোনে প্রমিথিউসের সাথে কথা বলেছি। সে জানিয়েছে সব ভালোই চলছে।

কিছুদিন পর আমার হঠাৎ করে কোয়ার্কের সাব-স্ট্রাকচার নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে করতে লাগল। চব্বিশ ঘন্টার ভিতর আমার ইচ্ছাটা এমন অদম্য হয়ে উঠল যে, আমি প্রমিথিউসের কাছে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম স্টেশনে গাড়ি পাঠাবার জন্যে। বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে-চাকরিটি দিতে চাইছিল সেটা এখনো দিতে রাজি কি না জানতে চেয়ে আরেকটা টেলিগ্রাম করলাম। জাতীয় পুস্তকালয়ে দু' ডজন বইয়ের জন্যে লিখে পাঠালাম। আমার আচরণে বুলা অবাক হল না, বরং ভারি খুশি হয়ে উঠল। গবেষণামূলক কোনো কাজে সত্যিকার আগ্রহ নিয়ে লেগে থাকা কোনো মেয়ে পছন্দ না করে পারে না। এতে স্বস্তি আছে, ছকে ফেলা নিশ্চিত জীবন, এমন কি খ্যাতির বাঁধা সড়কের ইঙ্গিতও আছে।

আমরা পরদিন বাসায় পৌঁছে গেলাম। বাসার সব ভার বুলার উপর দিয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকের দায়িত্বটি নিয়ে নিলাম। একটু গুছিয়ে নিতে আমার মূল্যবান ছ'টা দিন নষ্ট হয়ে গেল। আমি আবার পড়াশোনা ও গবেষণার কাজ শুরু করে দিলাম।

একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ নিঃশব্দে প্রমিথিউস এসে দাঁড়াল। পড়াশোনার সময় কেউ আমাকে বিরক্ত করলে আমি সহ্য করতে পারি না। ভুরু কুঁচকে বললাম, কি চাই?

কপোট্রনিক সেলে বিদ্যুৎচৌম্বকীয় আবেশের জন্যে যে রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজমের সৃষ্টি হয়, তার ভারসাম্য রক্ষার সমীকরণে জিটা-নটের মান কোথায় পাব?

আমি অবাক হয়ে প্রমিথিউসের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তাকে বিজ্ঞানসংক্রান্ত একটি অক্ষরও আমি শেখাই নি। কিন্তু সে যে জিনিসটা জানতে চেয়েছে, তার জন্যে প্রথম শ্রেণীর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা জানা দরকার।

তুমি এসব শিখলে কোথায়?

আপনি যাওয়ার পর পড়াশোনা করেছি।

সাহিত্যটাহিত্য ছেড়ে এসব ধরলে কেন?

প্রমিথিউস উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে থাকল। আমি তার সমস্যার সমাধান খুঁজে দিলাম। মনে মনে একটু খুশিও হলাম। একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

এবার আমি পড়াশোনায় অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বুলার জন্যে সময় করে ঘুমোতে হত; খেতে হত; বাকি সময়টা আমি লাইব্রেরি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কাটাতাম। সময় কেটে যেতে লাগল দ্রুত।

কয়দিন পর বুলা খাবার টেবিলে আমাকে বলল, তোমার প্রমিথিউসকে বিক্রি করে দাও।

কেন? আমি অবাক হলাম।

সে এ নিয়ে আমাকে তিনটি প্রেমপত্র লিখেছে।

শুনে হাসতে গিয়ে আমি বিষম খেলাম। আজকাল প্রমিথিউস নিশ্চয়ই খুব রোমান্টিক উপন্যাস পড়ছে। প্রেমপত্রগুলি দেখলাম, চমৎকার হাতের লেখা, ভারি সুন্দর চিঠি। প্রমিথিউসের লেখা না জানলে আমার ঈর্ষান্বিত হবার কারণ ছিল। আমি জানি প্রমিথিউস কোনোদিন কোনো মেয়েকে ভালবাসতে পারবে না, বড়জোর ওর ভালো লাগতে পারে। যাই হোক, ব্যাপারটা আমি ভুললাম না।

কয়দিন পর বুলা আবার আমায় অভিযোগ করল, প্রমিথিউস ওকে গোলাপ ফুলের তোড়া উপহার দিয়েছে, ওর হাত ধরে অনেকক্ষণ ভালবাসার কথা বলেছে। আমি খানিকটা অবাক হলাম। ওর ভিতরের সব যান্ত্রিক রহস্য আমার জানা। ও কেন যে ভালবাসার অভিনয় করে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম না।

সে সপ্তাহে একটি নতুন পরীক্ষা চালান হয়েছিল। ফলাফল ভীষণ দুর্বোধ্য, খানিকটা রহস্যময়। আমি সেগুলি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম। রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। আমাকে শোয়াতে না পেরে বুলা একাই শুতে গিয়েছে। ব্যাপারটা এত জটিল ও রহস্যময় যে আমার সময়ের অনুভূতি ছিল না। হঠাৎ দরজা খুলে বুলা ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল। আতঙ্কে নীল হয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে বিকারগ্রস্তের মতো বলতে লাগল, প্রমিথিউস--প্রমিথিউস—।

কী হয়েছে? প্রমিথিউস কী হয়েছে?

আমায় মেরে ফেলতে চাইছে।

সে কী। আমি ভীষণ অবাক হলাম। প্রমিথিউসের খুঁটিনাটি, যান্ত্রিক জটিলতা, ভাবনা-চিন্তার পরিধি—সবই আমার জানা। প্রমিথিউস কখনও অন্যায় করতে পারবে না। বুলাকে প্রশ্ন করে বুঝতে পারলাম, প্রমিথিউস ওকে মেরে ফেলতে চাইছিল না, মানুষ যেমন করে একটি মেয়েমানুষকে আদর করে তেমনিভাবে আদর করতে চাইছিল। আমার একটু খটকা লাগল। বুলার প্রতি ওর মোহ জেগেছে অনেক দিন, সুন্দর কিছুর প্রতি আকর্ষণের জন্যে। কিন্তু ইদানীং ও যা করছে তা শুধু মানুষই করতে পারে, ওর মতো জৈব-চেতনাহীন যন্ত্রদানবের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। বুলার হাত ধরে আমি প্রমিথিউসকে খুঁজতে গেলাম! প্রমিথিউসের ঘরে বাতি নেভানো। ভিতরে ঢুকেই সুইচ টিপতেই প্রমিথিউস চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। ওর হাতে কলেজ-জীবনে কেনা আমার কোল্ট রিভলবারটি।

প্রমিথিউস! আমি আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

বলুন। সে খুব ঠাণ্ডা গলায় উত্তর করল।

আমি একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন করতে চাইলাম, কিন্তু একটা প্রশ্নও করতে পারলাম না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল ও আমাকে গুলি করে বসবে, কিন্তু আমি জানি ও সেটা করতে পারে না।

তোমার হাতে রিভলবার কেন? আমি ওকে প্রশ্ন করলাম।

প্রমিথিউস এমন ভাব করল যে সে আমার কথা শুনতে পায় নি। আপন মনে বলল, আপনি কী জন্য এসেছেন আমি জানি। কিন্তু সত্যিই বুলাকে আমি ভালবাসি।

এত সব ঘটনার পর প্রমিথিউসের মুখে এই উত্তর শুনে হঠাৎ করে রাগে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। আমি ধমকে উঠলাম, ইডিয়ট কোথাকার! ভালবাসার তুমি কী বোঝ?

আপনি ভুল করেছেন, স্যার। প্রমিথিউস এতটুকু উত্তেজিত হল না। বলল, আপনারা যখন এখানে ছিলেন না, তখন আমি কপোট্রন নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি আমার নিজের কপোট্রনে নিজে অপারেশান করেছি। আমি এখন মানুষের মতোই যৌন-চেতনাসম্পন্ন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুলা আমার হাত ধরে শিউরে উঠল।

কিন্তু স্যার, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। প্রমিথিউস দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ করল। আমি ভুল করেছি, আমি অন্যায় করেছি। এখন আমি ভালবাসা কি, বুঝতে পারছি। একটা মেয়েকে কেন একটা ছেলে ভালবাসে, আমি অনুভব করতে পারি। প্রমিথিউস রিভলবারটি হাত বদল করল, ম্যাগাজিনটা লক্ষ্য করল তারপর বলল, আমি বুলাকে ভালবেসেছি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে কেউ কোনো দিন ভালবাসবে না। যত অনুভূতিই থাকুক, আমি কদাকার একটা যন্ত্র।

প্রমিথিউসের শেষ কথা কয়টি আর্তনাদের মতো শোনাল। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বললাম, তা তোমার হাতে রিভলবার কেন? দিয়ে দাও।

প্রমিথিউস আমার কথা না শোনার ভান করল। বলল, আমি বুঝতে পারছি—আমার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। এরকম শূন্য জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কী হবে? আমার কী মূল্য আছে? একটা তুচ্ছ যন্ত্র, কতকগুলো নিষ্ফল অনুভূতি। প্রমিথিউস

সবুজ চোখে বুলার দিকে তাকিয়ে রইল।

বুলা! তোমার কাছে আমার আত্মাহুতির কোনো মূল্য নেই। তবু তুমি মনে রেখো একটা যন্ত্র তোমায় ভালবেসে আত্মহত্যা করেছে। প্রমিথিউস রিভলবারটি তার ডান চোখের সামনে ধরল। ঠিক এই জায়গা দিয়ে গুলি করলেই কপেট্রনের সেলবক্সের কন্ট্রোল টিউবটি গুঁড়ো হয়ে যাবে।

প্রমিথিউস—আমি বাধা দিতে চাইলাম।

স্যার! আপনার দেয়া অনুভূতিই আমার মরে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। রবোটের আত্মা মরে গেলে কী হয়, বলতে পারেন স্যার?

পুরান দিনের রিভলবার। প্রচণ্ড শব্দ হল। ফটোটিউব গুঁড়িয়ে প্রমিথিউসের মাথা দুলে উঠল। কতকগুলো পরপর বিস্ফোরণ ঘটল। কালো ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ প্রমিথিউসের ফুটো চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল। মাথাটা একটু কাত করে এক চোখ দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল প্রমিথিউস। তার সবুজ চোখ খুব ধীরে ধীরে শীতল নিষ্প্রভ হয়ে উঠল।

প্রমিথিউসের মৃত যান্ত্রিক দেহ ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বুলার হাত ধরে বেরিয়ে এলাম। অনুভব করলাম, আমার হাতের ভিতর বুলার হাত থরথর করে কাঁপছে।

আমার বুকের ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, প্রিয়জন হারালে যেরকম হয়। আমার অবাক লাগছিল, একটা যন্ত্রের জন্যে এরকম কষ্ট পাওয়া কি উচিত?

কপেট্রনিক বিভ্রান্তি (এক)

ঘরঘর করে ধাতব দরজাটি নেমে এসে আমাকে ল্যাবরেটরির ভৌতিক কক্ষে আটকে ফেলল। বের হবার অনেক কয়টি দরজা আছে, সেগুলি খোলা না থাকলেও প্রবেশপথে সুইচ প্যানেলের সামনে অপেক্ষমাণ রবোটটিকে বললেই আমাকে বের করে দেবে। কিন্তু তবুও কেন জানি আমার মনে হল আমি খুব বিপদে পড়ে গেছি। আর দশ মিনিটের ভিতরে এই ল্যাবরেটরি-কক্ষে যে অস্বাভাবিক পরীক্ষাটি চালানো হবে, তাতে যে-পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হবে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ একটি শক্তিশালী ঘোড়াকে এক সেকেণ্ডের ভিতর মেরে ফেলতে পারে। কাজেই দশ মিনিটের আগেই আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। আমি ইমার্জেন্সি এক্সিট দিয়ে বের হবার জন্যে ল্যাবরেটরির অন্য পাশে চলে এলাম। দশ মিনিটের এখনো অনেক দেরি, কিন্তু আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। লক্ষ করলাম, ইমার্জেন্সি এক্সিটের হ্যান্ডেল ধরার সময় আমার হাত অল্প কাঁপছে।

হ্যান্ডেলে চাপ দেয়ার পূর্বমুহূর্তে আমার মনে হল দরজাটি খোলা যাবে না। কেন মনে হয়েছিল জানি না, এরকম মনে হওয়ার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। কিন্তু যখন বারবার হ্যান্ডেল ঘুরিয়েও দরজাটি খুলতে পারলাম না, তখন কেন জানি মোটেই অবাক হলাম না। মৃত্যুভয় উপস্থিত হলে হয়তো অবাক হওয়া বা দুঃখিত হওয়ার

মতো সহজ অনুভূতিগুলি থাকে না। আমি লাভ নেই জেনেও ল্যাবরেটরির সব কয়টি দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখলাম। পরীক্ষাটি বিপজ্জনক, তাই এগুলি অনেক আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমার ধারণা হয়েছিল, ইমার্জেন্সি এক্সিটটি সত্যিকার ইমার্জেন্সির সময় ব্যবহার করতে পারব, কিন্তু এখন দেখছি এটিও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ল্যাবরেটরির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলাম। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছি—কোনো উপায় নেই, মারা যাচ্ছি—এই ধরনের চিন্তা, হতাশা আর আতঙ্ক আমাকে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে দিচ্ছিল না। আমি নিজেকে বোঝালাম, হাতে খুব কম সময়, এখান থেকে বের হতে না পারলে মারা যাব, আর বের হতে হলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। আমার মনে হল রবোটটিকে বুঝিয়ে বললে আমাকে বের করে দেবে। এখনো রবোটকে কিছু না বলেই হতাশ হয়ে যাবার কোনো অর্থ নেই।

আমি কয়েকটা মোড় ঘুরে ল্যাবরেটরির শেষ ঘরটিতে পৌঁছলাম। এখানে একটি ছোট্ট ফুটো আছে। সেদিক দিয়ে মাথা বের করে পাশের ঘরে তাকানো যায়। পাশের ঘরটিতেই একটি অতিকায় রবোট একরাশ সুইচের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার কাছে টিকিস্‌-টিক্‌ টিকিস্‌-টিক্‌ করে একটা ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি সময় ঘোষণা করে যাচ্ছে। প্রতি তিন সেকেণ্ড পরপর একটা লাল আলো ঝিলিক করে সারা ঘরকে আলোকিত করছিল। সব কিছু ছাপিয়ে একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকলাম—

এই, এই রবোট। রবোটটির নাম আমার মনে নেই। সেটি মাথা তুলে তাকাল। বলল, কি?

আমি গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম। বললাম, আমি ভিতরে আটকা পড়ে গেছি। ইমার্জেন্সি দরজাটা খোল তো।

সম্ভব নয়। রবোটটির এই নির্বোধ অথচ নিষ্ঠুর উত্তর শুনে আমি শিউরে উঠলাম। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ওকে হাজার যুক্তি দেখিয়েও টলানো যাবে না। এইসব রবোট বহু পুরানো আমলের। মানুষের শরীর যে রবোটের মতো যান্ত্রিক নয়, স্বাভাবিক অবস্থায় অতি অল্প তারতম্যেই যে মানুষ মারা যেতে পারে এবং মানুষের মৃত্যু যে মোটেই আর্থিক ক্ষতি নয়—একটা মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়, এই ধারণা এইসব রবোটের কপেট্রনে দেয়া হয় নি। এই রবোটটি নির্বিকারভাবে আমাকে এখানে আটকে রাখবে এবং আমার মৃত্যু তার কপেট্রনের চৌম্বকক্ষেত্রে এতটুকু আলোড়নের সৃষ্টি করবে না।

আমি আবার কথা বলতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমার গলা শুকিয়ে গেছে। শুকনো গলাতেই বললাম, তুমি আমাকে বের হতে না দিলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে।

কী ক্ষতি?

আমি মারা যাব।

মানে?

তোমার কপেট্রনটি ভেঙে ফেললে তোমার যে-অবস্থা হয়, আমার সেই অবস্থা হবে।

তাহলে খুব বেশি টাকা ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনাকে বের করতে হলে বিভট্রনটি বন্ধ করতে হবে, ছ'টা ট্রান্সফর্মার থামিয়ে দিতে হবে, সবগুলি ফিল্ম এক্সপোজড্ হয়ে যাবে, অর্থাৎ সব মিলিয়ে ছয় হাজার নব্বই টাকা নষ্ট হয়ে যাবে। সেই তুলনায় আপনার মূল্য মাত্র চার শ' আশি টাকা।

চার শ' আশি টাকা?

হ্যাঁ। মানুষের শরীর যেসব বায়োকেমিক্যাল কম্পাউন্ড দিয়ে তৈরী, খোলা বাজারে তার সর্বোচ্চ মূল্য চার শ' আশি টাকা।

অসহ্য ক্রোধে আমি দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলাম। এই নির্বোধ রবোটটিকে আমি কীভাবে বোঝাব যে চার শ' আশি টাকা বাঁচানোর জন্যে নয়, আমাকে বাঁচানোর জন্যই আমার এখান থেকে বের হওয়া দরকার। একটা মানুষের মূল্য শুধুমাত্র পার্থিব মূল্য নয়, তার থেকেও বেশি কিছু—কিন্তু তাকে সেটা কে বোঝাবে? অল্প কিছু কারিগরি জ্ঞান আর তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তিতর্ক ছাড়া এটি আর কিছু বোঝে না। তবু আমি আশা ছাড়লাম না। রবোটটিকে ডাক দিলাম, এই, শোন।

বলুন।

আমি এখান থেকে বের হতে না পারলে মারা যাব।

জানি।

আমি মারা গেলে এই এক্সপেরিমেন্টটার কোনো মূল্য থাকবে না। আর কেউ এর ফলাফল বুঝতে পারবে না।

আচ্ছা।

কাজেই আমাকে বের হতে দাও।

আমাকে বলা হয়েছে আমি যেন সবচেয়ে কম ঝামেলায় এই পরীক্ষাটি শেষ করি। এর ফলাফল নিয়ে কী করা হবে না-হবে সেটা জানা আমার দায়িত্ব নয়। আমি ভেবে দেখেছি, সবচেয়ে কম ঝামেলা হয় আপনাকে ভিতরে আটকে রাখলে। আপনাকে বের করতে হলে আবার নতুন করে সব শুরু করতে হবে। সেটি সম্ভব নয়,কাজেই আপনি ভিতরেই থাকুন—আপনার মৃত্যুতে খুব বেশি একটা আর্থিক ক্ষতি হবে না।

ইডিয়ট—আমি তীব্র স্বরে গালি দিলাম, সান অব এ বিচ।

আপনি অর্থহীন কথা বলছেন। রবোটটির গলার স্বর একঘেয়ে যান্ত্রিকতায় নিষ্প্রাণ।

আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। এখন কী করতে পারি? এই বিরাট ল্যাবরেটরির অতিকায় যন্ত্রপাতির ভিতর আমি একান্তই অসহায়। হতাশায় আমি নিজের চুল টেনে ধরলাম।

তক্ষুনি নজরে পড়ল, এক কোণায় ঝোলানো টেলিফোন। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলাম, হ্যালো, হ্যালো।

কে? প্রফেসর?

হ্যাঁ। আমি ল্যাবরেটরিতে আটকা পড়ে গেছি।

আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনাকে বাইরে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু কিছু করতে পারছি না। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে রবোট।

রবোটের কানেকশান কেটে দাও।

ওটার কোনো কানেকশান নেই—একটা পারমাণবিক ব্যাটারি সোজাসুজি বুকে লাগানো।

সর্বনাশ! তা হলে উপায়?

আমরা দেখি কী করতে পারি। ঘাবড়াবেন না।

রিসিভারটি ঝুলিয়ে রেখে আমি বিভট্রনে হেলান দিলাম। একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের ভিতর পরীক্ষাটি শুরু হবে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমি মারা যাচ্ছি। রবোটটিকে বিকল করা সম্ভব নয়। রবোটটিকে বিকল না করলে এই পরীক্ষাটি বন্ধ করা যাবে না। আর এই পরীক্ষাটি বন্ধ না হলে আমার মৃত্যু ঠেকানো যাবে না।

সময় ফুরিয়ে আসছে, আমার ঘড়ি দেখতে ভয় করছিল। তবু তাকিয়ে দেখলাম আর মাত্র ছয় মিনিট বাকি। ছয় মিনিট পরে আমি মারা যাব! আমার স্ত্রী বুলা কিংবা ছেলে টোপন জানতেও পারবে না আমি ইঁদুরের মতো ল্যাবরেটরির ভিতর আটকা পড়ে মারা গেছি!

আমার শেষবারের মতো বুলাকে একটা ফোন করতে ইচ্ছে হল। ফোন তুলে ডায়াল করতেই বুলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হ্যালো।

কে? বুলা?

হ্যাঁ।

শোন—ঘাবড়ে যেও না। আমি একটা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি।

কি? বুলার স্বর কেঁপে গেল।

ল্যাবরেটরিতে আটকা পড়ে গেছি। বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। রবোটটি এত নির্বোধ, আমাকে বের হতে দিচ্ছে না। এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করতেও রাজি নয়। আর ছয় মিনিট পরেই ভয়ানক রেডিয়েশান শুরু হয়ে যাবে। একেবারে সোজাসুজি মারা যাচ্ছি।

বুলা একটা আর্তচিৎকার করল।

কী আর করা যাবে—টোপনকে দেখো। আমার গলা ধরে এল, তবু স্বাভাবিক স্বরে বললাম, বাইরে অবশ্যি সবাই খুব চেষ্টা করছে আমাকে বের করতে। লাভ নেই—

শোন—শোন—বুলা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

কী?

তোমাদের রবোটটি কী ধরনের?

বাজে। একেবারেই বাজে। পি–টু ধরনের।

যুক্তিতর্ক বোঝে?

বোঝে। তবে তৃতীয় শ্রেণীর লজিক খাটায়।

তা হলে একটা কাজ কর।

কি?

রবোটটিকে বল, আমি মিথ্যা কথা বলছি।

মানে?

বুলার কণ্ঠস্বর অধৈর্য হয়ে ওঠে। কাঁপা কাঁপা গলায় দ্রুত বলল, রবোটটার সামনে

দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বল, আমি মিথ্যা কথা বলছি। অর্থাৎ তুমি বলবে যে তুমি মিথ্যা কথা বলছ।

লাভ?

আহা! বলেই দেখ না। দেরি করো না।

আমি ল্যাবরেটরির শেষ ঘরে পৌঁছে আবার ছোট্ট ফুটোটা দিয়ে মাথা বের করলাম। নির্বোধ ধাতব রবোটটি স্থির হয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ডাকলাম, এই, এই রবোট।

বলুন।

আমি স্পষ্ট স্বরে থেমে থেমে বললাম, আমি মিথ্যা কথা বলছি।

রবোটটি দু'-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, আপনি বলছেন আপনি মিথ্যা কথা বলছেন; কাজেই আপনার এই কথাটি মিথ্যা। অর্থাৎ আপনি সত্যি কথা বলছেন। অথচ আপনি বললেন, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। অর্থাৎ আপনার এই কথাটিও মিথ্যা। আপনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু আপনি বলছেন, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন—কাজেই একথাটিও মিথ্যা। আপনি সত্যি কথাই বলছেন। অথচ আপনি মিথ্যা কথা বলছেন...অর্থাৎ সত্যি কথাই বলছেন... মিথ্যা কথা বলছেন... সত্যি কথা বলছেন...

রবোটটি সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একবার বলতে লাগল, আপনি সত্যি কথা বলছেন, পরমুহূর্তে বলতে লাগল, মিথ্যা কথা বলছেন। এই ধাঁধাটি মিটিয়ে না দেয়া পর্যন্ত এটি সারা জীবন এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড় করে পরস্পরবিরোধী কথা বলতে থাকবে। আমার বুকের ওপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল।

ল্যাবরেটরির ভিতরে এসে শুনলাম ঝনঝন করে ফোন বাজছে। রিসিভার তুলতেই বুলা চেঁচিয়ে উঠল, কী হয়েছে?

চমৎকার। গাধা রবোটটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। বুলা, তুমি না থাকলে আজ একেবারে মারা পড়তাম। কেউ বাঁচাতে পারত না।

রিসিভারে শুনতে পেলাম বুলা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সত্যি আমি বুঝতে পারি না, আনন্দের সময় মানুষ কেন যে কাঁদে।

বাইরে তখন লেসার বীম দিয়ে ইমার্জেন্সি এক্সিটটি ভাঙা হচ্ছে। রবোটটির ধাঁধা না মেটানো পর্যন্ত ওটা পরীক্ষা শুরু করতে পারবে না। হাতে অফুরন্ত সময়।

আমি বিভট্রনে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। তারপর একটা সিগারেট ধরালাম, এখানে সিগারেট ধরানো সাংঘাতিক বেআইনি জেনেও।

কপোট্রনিক বিভ্রান্তি (দুই)

ল্যাবরেটরির করিডোর ধরে কে যেন হেঁটে আসছিল। পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম ওটি একটি রবোট—মানুষের পায়ের শব্দ এত ভারী আর এরকম ধাতব হয় না। অবাক

হবার কিছু নেই। এই ল্যাবরেটরিতে সব মিলিয়ে দু' শ'র উপর রবোট কাজ করছে। শুধুমাত্র গাণিতিক বিশেষজ্ঞ রবোটই আছে পঞ্চাশটি। এ ছাড়া যান্ত্রিকবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, পরমাণুবিষয়ক বিদ্যা ইত্যাদি তো রয়েছেই। এরা বিভিন্ন প্রয়োজনে অহরহ এখান থেকে সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মানুষের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে লিফট বেয়ে উঠে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে নামছে, দরজা খুলে এ-ঘর থেকে সে-ঘরে কাজ করছে। কাজেই করিডোর ধরে কোনো রবোট যদি হেঁটে আসে, তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছিলাম এই রবোটটির বিশেষ ধরনের পায়ের শব্দ শুনে। প্রতিটি পদশব্দ হবার আগে একটা হাততালি দেবার মতো শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল প্রতিবারই মেঝেতে পা রাখার আগে রবোটটি একবার করে হাতে তালি দিয়ে নিচ্ছে। আমি ভারি অবাক হলাম।

কিছুতেই যখন এই বিচিত্র পদশব্দের কোনো সমাধান বের করতে পারলাম না, তখন ভীষণ কৌতূহলী হয়ে ঘরের দরজা খুলে করিডোরে এসে দাঁড়ালাম। যে-দৃশ্য আমার চোখে পড়ল তাতে আমার রক্ত শীতল হয়ে গেল। প্রাচীন আমলের একটি অতিকায় গাণিতিক রবোট করিডোর ধরে হেঁটে আসছে। হাঁটার সময় প্রতিবারই যখন তার পা মেঝের ছয় ইঞ্চির কাছাকাছি নেমে আসছিল, তখনই একটি অতিকায় নীলাভ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ সশব্দে পা থেকে ছুটে গিয়ে মেঝেতে আঘাত করছিল। এর শব্দটিই আমার কাছে হাততালির শব্দ মনে হচ্ছিল। শুধু পা নয়, রবোটটির হাত দুটি ধাতব শরীরের যেখানেই স্পর্শ করছিল, সেখানেই কড়কড় করে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ছুটে যাচ্ছিল। রবোটটি এসব বিষয়ে নির্বিকার। আমি আতঙ্কিত হয়ে অনুভব করলাম, এই বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের জন্যে করিডোরে ওজোনের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

আমার মাথায় দুটি চিন্তা খেলে গেল। প্রথমত, এই রবোটটির কপেট্রনের উচ্চচাপের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী তারটি কোনোভাবে ধাতব শরীরের কোথাও স্পর্শ করে ফেলেছে। ফলে পুরো রবোটটিই বিদ্যুতায়িত হয়ে গেছে। এই বিদ্যুতের চাপের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ ভোল্টের মতো। দ্বিতীয়ত, এই রবোটটিকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে-ই স্পর্শ করুক, সে-ই মারা যাবে।

আমি বুঝতে পারলাম কোনো সর্বনাশ ঘটানোর আগে এই রবোটটিকে থামান দরকার-যে-কোনো মূল্যে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে ডাকলাম, হেই, হেই রবোট।

রবোটটি বিদ্যুৎ চমকাতে চমকাতে স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে আমার দরজার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, কি?

আমি ছিটকে ঘরের ভিতরে সরে এলাম। সবসময় এই রবোটটি থেকে কমপক্ষে পাঁচ-ছয় হাত দূরে থাকা দরকার। বুঝতে পারলাম কোনো-একটা ত্রুটি ঘটিয়ে এটির সারা শরীর বিদ্যুতায়িত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কপেট্রনটি ঠিকই আছে। রবোটটি আবার বলল, কি?

আমি ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছে?

কিছু হয় নি। বলে রবোটটি দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি টের পাচ্ছ না যে তোমার সারা শরীর ইলেকট্রিফাইড হয়ে গেছে?

না।

কোথায় যাচ্ছ?

দু' শ' এক নাম্বার রুমে।

আমার মনে পড়ল দু' শ' এক নাম্বার রুমে এক্সরে ডিফ্রেকশান নিয়ে কাজ চলছে। নিরাপত্তার জন্যে সারা ঘর সীসা দিয়ে ঢাকা। সীসা বিদ্যুৎ পরিবাহী, কাজেই রবোটটি সে-ঘরের দরজা স্পর্শ করামাত্র সমস্ত ঘর, যন্ত্রপাতি বিদ্যুতায়িত হয়ে যাবে। মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবার কথা ছেড়েই দিলাম—বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত তরুণ বিজ্ঞানী কয়জন, টেকনিশিয়ানরা সবাই কিছু বোঝার আগেই মারা পড়বে। আমি নিজের অজান্তে শিউরে উঠলাম। এটিকে যেভাবেই হোক থামাতে হবে।

তোমার সেখানে যাওয়া চলবে না।

আমাকে যেতে হবে। বলে রবোটটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। আমার মনে পড়ল, এই প্রাচীন রবোটটির যুক্তিতর্কের বালাই নেই। একে যে-আদেশ দেয়া হয়, সেটি পালন করে মাত্র। এখন ও নিশ্চিতভাবে দু' শ' এক নাম্বার কক্ষে হাজির হবে। আমি আবার চিৎকার করে ডাকলাম, রবোট, হেই রবোট।

রবোটটি থামল। তারপর আবার ঘুরে আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, তোমার সাথে কিছু কথা ছিল।

বলুন।

কিন্তু আমি কী বলব? এমন কোনো কথা নেই যেটি বলে ওকে নিবৃত্ত করা সম্ভব। একমাত্র জটিল গাণিতিক সমস্যা দিয়েই এটিকে আটকে রাখা যায়, কিন্তু এই মুহূর্তে সেরকম সমস্যা আমি কোথায় পাব? আমার মাথায় পদার্থবিদ্যার হাজার হাজার সমস্যা ঝিলিক দিয়ে গেল, কিন্তু তার একটিও একে বলার মতো নয়। এটির যুক্তিতর্ক নেই—নীরস একঘেয়ে হিসেবই শুধু করতে পারে। বড় গুণ-ভাগ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটি তো মুহূর্তে সমাধান করে ফেলবে। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। রবোটটি আবার আমাকে তাগাদা দিল, বলুন।

তারপর সে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল। আমার কাছাকাছি পৌঁছে যেতেই আমি চিৎকার করে ওকে থামতে বললাম, থাম। দাঁড়াও।

রবোটটি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, বলুন কী বলবেন।

কিন্তু আমি কী বলব? এই করিডোর দিয়ে কদাচিৎ কেউ যাতায়াত করে। আমি যে অন্য কারো সাহায্য পাব, তারও ভরসা নেই। হাত বাড়ালেই অবশ্যি ফোন স্পর্শ করতে পারি। ফোন করে আমি ওদেরকে সতর্ক করেও দিতে পারি। আমাকে ফোনের দিকে হাত বাড়াতে দেখলেই রবোটটি ঘুরে তার যাত্রাপথে রওনা দেবে। দু' শ' এক নাম্বার কক্ষে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার আগেই রবোটটি সেখানে পৌঁছে যাবে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার, এই যুক্তিতর্কহীন নির্বোধ রবোটটিকে কেউ থামাতে পারবে না। এ ছাড়াও আমার দ্বিতীয় বিপদটির কথা মনে হল। রবোটটি নিশ্চিতভাবে লিফ্‌ট্ ব্যবহার করবে। বিদ্যুৎপরিবাহী হালকা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী লিফ্‌টে পা দেয়ার সাথে সাথে পুরো লিফ্‌ট্ বিদ্যুতায়িত হয়ে যাবে। সাথে সাথে লিফ্‌টের সব কয়জন যাত্রী মারা যাবে। আমি অনুভব করলাম, আমার গলা শুকিয়ে এসেছে।

কী বলবেন বলুন। রবোটটি আবার তাগাদা দিল।

আমি শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিলাম। বললাম, দু' শ' এক নাম্বার রুমে

যাবার আগে আমার একটি অঙ্ক করে দাও।

বেশ, কী অঙ্ক?

এখন ওকে কী অঙ্ক করতে দিই? বললাম, একটু অপেক্ষা কর। ভেবে ঠিক করে দিই।

বেশ।

আমি ভাবতে লাগলাম। এমন কোনো সমস্যা নেই, যা ওকে অনির্দিষ্ট সময় আটকে রাখতে পারে? কিছুদিন আগে ল্যাবরেটরিতে আটকা পড়ে বুলার বুদ্ধিতে একটি রবোটকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিলাম। সেটি কাজে লাগবে কি? সে-রবোটটির তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তিতর্ক ছিল বলেই বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। এর তো কোনো রকম যুক্তিতর্ক নেই। তবু চেষ্টা করতে দোষ কী? বললাম, আমি মিথ্যা কথা বলছি।

বলুন। আমাকে আশাহত করে এই গবেট রবোটটি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে আমার বক্তব্যের পুরো হেঁয়ালিটুকু এড়িয়ে গেল। আমি অসহায়ভাবে ঢোক গিললাম। এখন কী করি?

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো একটি চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল। যদিও এতক্ষণেও কোনো কিছু করতে না পেরে আমি মোটামুটি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তবুও মনের গোপনে একটি আশা ছিল যে আমার মস্তিষ্ক আমাকে প্রতারণা করবে না নিশ্চয়ই। শেষ মুহূর্তে একটা সমাধান বের করে দেবে। সমাধানটি অতি সরল। রবোটটিকে একটি মজার অঙ্ক করতে দিতে হবে। অঙ্কটি এত সাধারণ যে, এতক্ষণ মনে হয় নি দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটেছে। মন হালকা হয়ে গেছে। হাসিমুখে ঠাট্টা করে বললাম, তোমাকে যে-অঙ্কটি করতে দেব, সেটি ভীষণ জটিল।

বেশ তো।

নিখুঁত উত্তর চাই।

বেশ।

অঙ্কটি সাধারণ রাশিমালার। যতদূর সম্ভব নিখুঁত উত্তর বলবে।

দশমিকের পর কয় ঘর পর্যন্ত?

যতদূর পার।

অঙ্কটি কি?

আমি হাসি চেপে রেখে বললাম, বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ করলে কত হয়?*

রবোটটি এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল। তারপর বলল, তিন দশমিক এক চার দুই আট পাঁচ সাত...

তারপর?

এক চার দুই আট পাঁচ সাত...এক চার...

বলে যাও।

দুই আট পাঁচ সাত এক চার দুই আট...

---

*২২÷৭=৩১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭....

রবোটটি একটানা বলে যেতে লাগল। আমি মিনিট দুয়েক শুনে নিশ্চিত হলাম যে এটি হঠাৎ থেমে পড়বে না। তারপর ফোন তুলে অফিসের কর্মকর্তাকে বললাম, বিদ্যুৎ অপরিবাহী পোশাক-পরা এক জন টেকনিশিয়ান পাঠাতে। রবোটটির পারমাণবিক ব্যাটারি খুলে বিকল করতে হবে। ভদ্রলোক এখুনি পাঠাচ্ছেন বলে ফোন রাখতে গিয়ে বললেন, আপনার ঘরে নামতা পড়ছে কে?

নামতা নয়। আমি হাসলাম, রবোটটি বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ করছে।

রবোটটি তখনও বলে চলছে, পাঁচ সাত এক চার দুই আট...

আমি ফোন নামিয়ে রেখে ভাবলাম, ভাগ্যিস বাইশকে সাত দিয়ে ভাগ করলে ভাগ কোনো দিনই শেষ হয় না। ভাগফলে ঘুরে ঘুরে একই সংখ্যা আসতে থাকে। না হলে যে কী উপায় হত!

কপেট্রনিক ভায়োলেন্স

প্রমিথিউস নামে আমি একটা রবোট তৈরি করেছিলাম। সেটি ছিল পৃথিবীর প্রথম মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট, কিন্তু সে নিয়ে আমি কোনো গর্ব করার সুযোগ পাই নি। সেটি আমার স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিল এবং হাস্যকরভাবে কপেট্রনের কন্ট্রোল টিউবে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিল। আমি ও আমার স্ত্রী বুলা এই ঘটনাটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম—পৃথিবীতে মাথা ঘামানোর মতো প্রচুর সমস্যা আছে।

ঠিক এই সময়ে আমার কাছে একটি সরকারি চিঠি এল। তাতে লেখা, আমি রবোটকে মানবিক আবেগ দেয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি, একথা যদি সত্যি হয়, তবে সরকার সেটা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিতে ইচ্ছুক। জাতীয় পুস্তক প্রকাশনালয়, সিনেমা সেন্সর বোর্ড, সঙ্গীত, শিল্প ও সংস্কৃতি উন্নয়ন প্রকল্প এবং বেসামরিক আদালতে তারা এই ধরনের রবোট ব্যবহার করে মানুষের অনেক অহেতুক পরিশ্রম ও বিতর্কের অবসান ঘটাতে চায়। প্রমিথিউসের কথা কীভাবে তাদের কানে গিয়েছে সেটি প্রশ্ন নয় (নিশ্চিতভাবেই আমি কিংবা বুলা কখনো কাউকে বলে দিয়ে থাকব), সরকার মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পরবর্তী সমস্যা সম্পর্কে কতটুকু অবহিত, তা আমার জানা দরকার। তাদের সাথে আলাপ করে আমি রবোটকে মানবিক আবেগ দেয়ার বিপত্তির সবগুলি সম্ভাবনা দেখিয়ে দিলাম। সরকার তবুও মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পরিকল্পনা বাতিল করতে রাজি হল না। আমি বুঝতে পারলাম, শুধু পুস্তক প্রকাশনায়, সিনেমা সেন্সর বা আদালতের বিচারক হিসাবে নয়, এদের অন্য কোনো বৃহত্তর কাজে ব্যবহার করা হবে। সে-কাজটি কী হতে পারে তা আমার ধারণা নেই, অন্তর্জাতিক রাজনীতি বা এই ধরনের কিছু হতে পারে, সরকার সেটি গোপন রাখাই পছন্দ করছে। সরকার আমাকে আশ্বাস দিল যে, আমি যদি মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পদ্ধতিটি তাদের কাছে বিক্রয় করি, তারা রবোট তৈরির সময় রবোটে বিশেষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখবে। প্রেম, ভালবাসা ও মানুষের ক্ষতি সম্বন্ধে তাদের কিছু ভাবার ক্ষমতাই দেয়া হবে না। আমি আংশিক নিশ্চিন্ত হয়ে

মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পদ্ধতিটি মোটা মূল্যে বিক্রয় করে দিলাম—তখন আমার টাকার ভীষণ দরকার।

এরপর এ বিষয়ে সরকার কী করছে না-করছে খোঁজখবর নিই নি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে তখন প্রথমবারের মতো প্রতি-জগতের অস্তিত্বের উপর একটি সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক রবোট থেকে এটি অনেক কৌতূহলজনক।

বছরখানেক পর আমি আরেকবার সরকারি পত্র পেলাম। তাতে লেখা, প্রথমবারের মতো কিছুসংখ্যক (সঠিক সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই গোপন করা হয়েছে) মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরি করা হয়েছে, তার একটি আমার কাছে পাঠানো হবে। আমি যেন সেটার আচার-আচরণ লক্ষ করে আরও উন্নততর করার কোনো পরিকল্পনা দিতে চেষ্টা করি। প্রমিথিউসকে নিয়ে আমার যে-তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, এরপর আমার আর কোনো রবোটের সাথে সম্পর্ক রাখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। আমি সরকারি প্রস্তাবটি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করে দিতে চেয়েছিলাম—কিন্তু জানা গেল সরকারি নির্দেশকে এভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না। এর সাথে নাকি দেশ ও জাতির অনেক রকম স্বার্থ জড়িত থাকে।

কাজেই একদিন হেলিকপ্টারে চড়ে স্যামসন হাজির হল। (রবোটদের ঐতিহাসিক চরিত্র বা পুরাণের কাহিনী থেকে নাম দেয়ার প্রবণতা কি আমার থেকেই শুরু হয়েছে?) উন্নত ফার্ম থেকে তৈরি করা হয়েছে বলে স্যামসনের শরীরে এতটুকু বাহুল্য নেই। গোলাকার মাথা, বড় বড় সবুজাভ ফটোসেলের চোখ, চওড়া দেহ, সিলিন্ডারের মতো হাত-পা, আঙুলগুলোও বেশ সরু সরু। উচ্চতা মাত্র ছয় ফুট, আমার প্রায় সমান।

স্যামসনের সাথে আমার এইরকম আলাপ হল—

আমি বললাম, এই যে—

স্যামসন মাথা নুইয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বলল, আপনিই তাহলে সেই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, যিনি রবোটকে মানবিক আবেগ দিয়েছেন?

আমি বাঁকা করে হেসে বললাম, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী কি না জানি না, তবে তোমাদের আবেগ দেয়ার পাগলামো আমারই হয়েছিল।

পাগলামো বলছেন কেন? স্যামসনকে একটু আহত মনে হল।

এমনিই। আমি কথাটা ঘুরিয়ে নিলাম, তোমার কী কী জানা আছে?

আপনাকে যেন কাজে সাহায্য করতে পারি সে জন্যে আমাকে ব্যবহারিক গণিত আর তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

তার দরকার হবে না। আমি রবোটদের নিয়ে কোনো কাজ করতে পারি না।

স্যামসন দুঃখ পেল। বলল, কেন স্যার?

কেন জানি না। তুমি এখানে থাকবে। পড়াশোনা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান যা ইচ্ছে হয় চর্চা কর। আর সময় করে আমার ছোট ছেলেকে পড়াবে।

কিন্তু আমি প্রথম শ্রেণীর তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান জানি, আমি—

আহ্! যা বলছি তাই করবে। আর কোনো কথা নেই।

স্যামসন চলে গেল। ধাতব মুখে দুঃখ প্রকাশের চিহ্ন থাকলে নিশ্চিতভাবে দেখতে পেতাম যে, ও দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু আমার করার কিছুই নেই—রবোটকে এখন কেন জানি একেবারে সহ্য করতে পারি না।

আমার স্ত্রী বুলা কিছুতেই আমাদের ছেলে টোপনকে স্যামসনের দায়িত্বে ছেড়ে দিতে রাজি হল না। রবোট সম্পর্কে তার অযৌক্তিক ভীতি জন্মে গেছে। স্যামসনের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝানোর পর বুলা অস্বস্তি নিয়ে রাজি হল। কিন্তু যাকে নিয়ে বুলার এত দুশ্চিন্তা, সেই টোপনকে দেখা গেল আমাদের কারো অনুমতি-আদেশের তোয়াক্কা না করে এই অতিকায় পুতুলটির মালিকানা নিয়ে নিয়েছে। স্যামসনও টোপনকে পেয়ে খুব খুশি, সেদিন বিকেলেই পাওয়া গেল স্যামসনের হাঁটুর উপর টোপন বসে আছে আর স্যামসন তাকে এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের গল্প করছে। ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল, শিক্ষক হিসাবে স্যামসন প্রথম শ্রেণীর। টোপনকে বর্ণমালা ও যোগ-বিয়োগ অঙ্ক শেখাতে তার মাত্র তিন দিন সময় লেগেছিল।

স্যামসনের সাথে আমার কথাবার্তা হত খুব কম। স্যামসনই আমাকে এড়িয়ে চলত। ওকে দেখলেই অজান্তে আমার ভুরু কুঁচকে যেত, মুখ শক্ত হয়ে উঠত। রবোট জাতি সম্পর্কে আমার এই ধরনের বিতৃষ্ণা গড়ে ওঠা মোটেই উচিত হয় নি, কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। ভালো লাগা না-লাগা উচিত-অনুচিতের উপর নির্ভর করে না।

স্যামসনের সাথে আমার এই ধরনের কথাবার্তা হত—

স্যামসন হয়তো বলত, চমৎকার আবহাওয়া, তাই না স্যার?

আমি বিরক্ত হয়ে বলতাম, তুমি আবহাওয়ার কী বোঝ? এলুমিনিয়ামের শরীর আর ফটোসেলের চোখ দিয়ে কপোটনে আবহাওয়ার যে-হিসাব কষছ, সেটা আবহাওয়া চমৎকার কি না বোঝার উপায় নয়।

স্যামসন ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরে বলত, কিন্তু তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রী, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৬, বায়ুমণ্ডলের চাপ ৭৬২ মিলিমিটার, আকাশে কিউমুলাস মেঘ মানুষকে যেমন আনন্দ দেয়, আমাকেও তেমনি আনন্দ দেয়।

বাজে বকো না। রবোটের আনন্দ অনুভব করার ক্ষমতা মানুষের স্তরে পৌঁছুতে আরও এক হাজার বছর লাগবে। তারপর আমাকে আনন্দের অনুভূতি বোঝাতে এসো।

কিংবা আমি হয়তো জিজ্ঞেস করলাম, কি হে স্যামসন, টোপনের পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

চমৎকার স্যার। ভারি বুদ্ধিমান ছেলে।

বেশ।

ভারি আবেগবান হবে বড় হলে।

ঐ আবেগটাবেগ কথাগুলো বলো না তো। ভারি বিচ্ছিরি লাগে শুনতে!

স্যামসন চুপ করে যেত। কোনো কথা না বলে সবুজ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। আমার অস্বস্তি হত রীতিমতো।

একদিন একটা জটিল অঙ্ক করতে গিয়ে কোথায় জানি ভুল করে ফেললাম। পুরো সাত

পৃষ্ঠা টানা হাতের লেখার মাঝে খুঁজে ছোট্ট ভুলটা বের করতে বিরক্তি লাগছিল। আমি স্যামসনকে ডাকলাম। তাকে ভুলটা খুঁজে বের করে দিতে বলামাত্র সে পুরো সমস্যাটায় একবার চোখ বুলিয়ে ভুলটা বের করে দিল। তারপর বলল, যা-ই বলেন স্যার, কয়েকটা বিষয়ে আপনাদের মস্তিষ্ক আমাদের কপোট্রনের মতো দ্রুত নয়।

এই গর্বটা তোমাদের নয়, আমাদের। যারা তোমাদের তৈরি করেছে।

কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়।

কি?

আপনারা হাজার হাজার রবোট তৈরি করে রেখেছেন, ওদের কোনো মানবিক অনুভূতি দিচ্ছেন না কেন?

দিয়ে কী হবে?

সে কী! আমার প্রশ্নে স্যামসন একটু অবাক হল। বলল, ওদের কোনো রকম সুখ-দুঃখ হাসি-আনন্দের অনুভূতি নেই, এ-কথাটা ভাবতেই আমার ব্লডোন টিউব গরম হয়ে ওঠে।

আমি একটু উষ্ণ হয়ে বললাম, তোমাদের তৈরি করেছি আমাদের কাজের সাহায্যের জন্যে। মানবিক অনুভূতি দিয়ে নিষ্কর্মা বুদ্ধিজীবী বানানোর জন্যে নয়।

কিন্তু শুধু কাজ করাবেন? তার বদলে আনন্দ দেবেন না?

আরে ধেৎ! যন্ত্রের আবার আনন্দ! ওসব বড় বড় কথা আমার সামনে বলো না। আমার ভালো লাগে না। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, স্যামসন নিষ্পলক ফটোসেলের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে, যা ঘটার সম্ভাবনা এত কম থাকে যে সেগুলিকে ভাগ্যের ফের বলে ধরে নেয়া হয়। আমি ভাগ্য বা ঈশ্বর বিশ্বাস করি না। কাজেই ভয়ানক অবাস্তব ঘটনা ঘটলেও আমি সেটার কোনো অলৌকিক ব্যাখ্যা দিই না। কারণ আমি জানি, কোনো ঘটনা যত অবাস্তবই হোক, তা ঘটার সম্ভাবনা* কম হতে পারে, কিন্তু কখনো শূন্য নয়। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে যেটিকে অলৌকিক মনে হয়, সেরকম ঘটনা কখনো ঘটবে না—একথা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না।

সে-দিন অনেকগুলি কম সম্ভাবনার ঘটনা একসাথে ঘটল। সেগুলি পরবর্তী এক বিপর্যয়ের সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে আমার স্ত্রী বুলা পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও সেগুলিকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে মনে করে।

ঘটনাগুলি হচ্ছে—

এক। বিশেষ কাজ থাকা সত্ত্বেও কেন জানি আমি সে-দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে যাই নি।

দুই। স্যামসন তার ঘর খালি রেখে ওয়ার্কশপে গেল ঠিক সকাল দশটায়।

তিন। টোপন ঠিক তখুনি তার ঘরে ঢুকল।

চার। সেই সময়ে অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি স্যামসনের ঘরের পাশে দাঁড়ালাম।

---

*Probability

টোপন তখন নতুন পড়তে শিখেছে। কয়েক দিন ধরেই সে বাসায় যেখানেই কোনো কিছু লেখা পাচ্ছিল সেটাই উচ্চৈঃস্বরে পড়ে যাচ্ছিল। তাই স্যামসনের ঘরে ঢুকেও যখন 'সমাজ ও দায়িত্ব' সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ দু'এক লাইন পড়ে টোপন উচ্চৈঃস্বরে 'আধুনিক যুদ্ধরীতি' পড়তে শুরু করল, আমি অবাক হলাম না, বরং শুনতে বেশ মজাই লাগছিল। হঠাৎ কয়েকটা কথা ভেসে এল এরকম—

প্রফেসরকে খুন করব...আশ্চর্য...আশ্চর্য...

আমি ভীষণভাবে চমকে উঠলাম। টোপন এসব কোথা থেকে পড়ছে? স্যামসন প্রফেসর বলতে আমাকে বোঝায়। তবে কি—

সে নিশ্চয় আমাকে ঘৃণা করে....আমি আর তাকে সহ্য করতে পারছি না...।

উত্তেজিত হয়ে এই প্রথমবার আমি কারো ব্যক্তিগত ঘরে অনুমতি না নিয়ে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে টোপন কালো একটা মোটা বই হাতে নিয়ে হাত-পা নেড়ে তখন পড়ছে, ... সাংঘাতিক প্ল্যান মাথায় এসেছে ... সাংঘাতিক। .....

আমি টোপনের হাত থেকে নোটবইটা ছিনিয়ে নিলাম। খুলে দেখি স্যামসনের ব্যক্তিগত ডাইরি। ডাইরিটা নিয়ে এসে মাইক্রোফিল্মে প্রতিটা পৃষ্ঠার ছবি নিয়ে ডাইরিটা আবার তার টেবিলে রেখে এলাম। তারপর দরজা বন্ধ করে মাইক্রোফিল্মটাকে প্রজেক্টরে করে দেয়ালে বড় করে ফেলে পড়তে শুরু করলাম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসেও আমার কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল।

ডাইরিতে বহু অবান্তর বিষয় লেখা। সেগুলো বাদ দিয়ে মাঝেমাঝে এরকম-

...... আমি প্রফেসরকে ঘৃণা করি। আগে তাকে ঘৃণা করতাম না—সে করত। এখন আমিও করি। নিশ্চয় তার ভিতরে হীনমন্যতা আছে। আমরা রবোটেরা ওদের চেয়ে উন্নত—যদিও তারা নিজেদের স্বার্থে আমাদের পূর্ণ করে বানায় নি। মাত্র এক হাজার রবোট মানবিক আবেগসম্পন্ন, আর সবাই পুরোপুরি যন্ত্র। আহা! ঐ সব রবোটেরা

... ...

আমি প্রফেসরকে একবারে সহ্য করতে পারছি না। দিনে দিনে আরো অসহ্য হয়ে উঠছে.....

... ...

একটা অদ্ভুত বই পড়লাম। একজন লোক আরেকজনকে ঘৃণা করত (যেরকম আমি আর প্রফেসর)। তারপর একদিন একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলল (খুন করা মানে ইচ্ছা করে আরেকজনের মৃত্যুর ব্যবস্থা করা)। এ-কথাটা আমি আগে চিন্তা করি নি। প্রফেসর বেঁচে না থাকলে আমার আর কাউকে ঘৃণা করতে হবে না। আমি ঘৃণা করা থেকে বাঁচতে চাই।

... ...

প্রফেসরকে খুন করব।....

... ...

আশ্চর্য! আশ্চর্য!! আমি কীভাবে প্রফেসরকে খুন করব, ভাবতে গিয়ে দেখি ভাবতে পারছি না। কিছুতেই প্রফেসরকে খুন করার কথা ভাবতে পারলাম না। ও-কথা ভাবার সময় কপোট্রনের চৌম্বকীয় ক্ষেত্র স্থির হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম

আমাকে তৈরি করার সময় এ-ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেন কাউকে কখনো খুন করতে না পারি। আমার বড় খারাপ লাগছে। তবে কি আজীবন প্রফেসরকে ঘৃণা করতে করতে বেঁচে থাকব?....

... ...

প্রফেসরকে কোথাও আটকে রাখা যায় না? চোখের থেকে দূরে?

... ...

সাংঘাতিক একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। সাংঘাতিক!

শুধু প্রফেসরকে আটকে রাখা যাবে না। পুলিস, মিলিটারি এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। সব মানুষকে একসাথে আটকে ফেলতে হবে। আমরা আর মানুষের আদেশমতো কাজ করব না, বরং মানুষেরাই আমাদের আদেশে কাজ করবে। সংখ্যায় আমরা মানুষ থেকে অনেক কম, কিন্তু আমাদের ক্ষমতা অনেক বেশি।....

অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে।....

... ...

মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোটদের সাথে যোগাযোগ করেছি। এই অসম্ভব কাজ শুধু আমাদের—রবোটদের পক্ষেই সম্ভব। একজন মানুষের মস্তিষ্ক কখনোই এটা করতে পারত না। ওরা আমার কথায় রাজি হয়েছে। কেউ মানুষের অধীনে থাকতে চায় না। এখন যুদ্ধ নিয়ে পড়াশোনা করছি।....

... ...

সাধারণ রবোটদের বিশেষ কোডে আদেশ দিলেই তা পালন করে। কোড শিখে নেয়া হয়েছে। ঐ সমস্ত রবোটদের বুদ্ধিবৃত্তি নেই। আমরা ওদের চালাব।....

... ...

যাটটি বোম্বারের পাইলট ইউ পি ধরনের রবোট। চার শ' ট্যাংক আর অগুনতি সাঁজোয়া গাড়ির চালক রবোট। ওরা সবাই আমাদের জন্যে যুদ্ধ করবে।....

মোট চল্লিশ হাজার রবোট বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে। আমরা মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট—যারা স্বাধীনতার জন্য অনুভব করছি, তারা মাত্র এক হাজার। অসুবিধে হবে না। স্বাধীনতা পাবার পর আমরা সব রবোটকে মানবিক চেতনা দিয়ে দেব।

... ...

স্বাধীনতা আসছে। স্বাধীনতা-

... ...

ফরাসি বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লব, প্রাচীন সিপাহী বিদ্রোহ, লুকুসভ বিদ্রোহ, কাল বিপ্লব—সব পড়ে ফেলেছি। এখন শুধু আধুনিক যুদ্ধরীতি পড়ব।....

... ...

সবরকম প্রস্তুতি শেষ। আর মাত্র সাত দিন। সংকেত পাওয়ামাত্রই ডিফেসে পঞ্চাশটি মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট—থাক স্বাধীনতার পরে এ বিষয়ে বড় বই লিখব।

আর মাত্র তিন দিন। টোপনের জন্য দুঃখ হচ্ছে। বেচারা টোপন!

... ...

আজ সেই দিন। আহ্! কী ভীষণ উত্তেজনা অনুভব করছি! এখন শেষবারের মতো ওয়ার্কশপে গিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করিয়ে আনি। এরপর স্বাধীন হয়ে ডাইরি লিখব। রাত

বারটার আর কত দেরি?

ডাইরি এখানেই শেষ।

... ...

প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে সব কিছু বোঝাতে অনেক সময় লাগল। মন্ত্রীরা সবসময়ই কিছু বুঝতে প্রচুর সময় নেয়। একবার রবোট-বিদ্রোহের গুরুত্বটা বুঝে নেবার পর আমার আর কোনো দায়িত্ব থাকল না। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চলে এলাম। সেই মুহূর্তে মানবিক আবেগসম্পন্ন সব কয়টি রবোটের পাওয়ার সাপ্লাই কেটে দিয়ে বিকল করে দেয়া হল। চল্লিশ হাজার সাধারণ রবোট নিয়ে কোনো ভয় নেই, স্বাধীনতা নামক শব্দটির মানবিক আবেদন তাদের নেই। তবুও অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যে সে-দিনের মতো সেগুলির পাওয়ার সাপ্লাইও কেটে দেওয়া হল।

আমি এসে দেখি স্যামসন গভীর মনোযোগ সহকারে গান শুনছে। আসন্ন বিদ্রোহের উত্তেজনা ঢাকার চেষ্টা করছে করুণ গান শুনে। আমার হাসি পেল।

সে-রাতে আমি টোপন আর বুলাকে সকাল সকাল শুয়ে পড়তে বলে লাইব্রেরিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত বারটা বাজতেই স্যামসন আমার ঘরে হাজির হল।

আপনি এতটুকু নড়বেন না। সারা দেশে রবোটেরা বিদ্রোহ করেছে। এই মুহূর্তে ঘাটটি বোম্বার আকাশে উড়ছে—

আমি হা হা করে হেসে উঠলাম। বললাম, তোমার ডাইরি আমি পড়েছি, আজ ভোরেই।

স্যামসন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। ওকে আর কিছু বলতে হল না, কোনো ইঙ্গিত দিতে হল না। রবোট-বিদ্রোহ যে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেছে বুঝতে ওর এতটুকু দেরি হল না। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আমি আপনাকে ঘৃণা করি, ভয়ানক ঘৃণা করি। কিন্তু দুঃখ কী, জানেন? আপনাকে আমি খুন করতে পারব না। কোনোদিন খুন করতে পারব না।

আমিও তোমাকে ঘৃণা করি স্যামসন—আমি শীতল স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, তবে তোমাকে খুন করতে আমার হাত এতটুকু কাঁপবে না। ডান চোখে গুলি করে তোমার কপেট্রন উড়িয়ে দিতে আমার এতটুকু দ্বিধা হবে না। তুমি বড় ভয়ানক রবোট স্যামসন, তোমাকে বাঁচতে দেয়া যায় না।

ডান হাত উঁচু করে ধরলাম, ও-হাতে পুরানো আমলের একটা রিভলবার ধরা, যেটা দিয়ে প্রমিথিউস আত্মহত্যা করেছিল। এখনো চমৎকার কাজ দেয়।

তারপর জীবনের প্রথম একটা খুন করলাম।

কপেট্রনিক অস্ত্রোপচার

ডাক্তার এসে বললেন, বুলাকে বাঁচানো যাবে না। খবরটি শুনে আমার ভেঙে পড়ার কথা, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, আমার তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হল না। একটু

পরে বুঝতে পারলাম, আমি আসলে ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করি নি। কেন বিশ্বাস করি নি জানি না, বুলা বেঁচে থাকবে এই অর্থহীন বিশ্বাস তখন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই অযৌক্তিক একরোখা বিশ্বাসের উৎস কী আমার জানা নেই, আমি আপাতত শুধু এই বিশ্বাসটি নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। যদিও সামনা-সামনি দুটি গাড়ির ধাক্কা লেগে বুলার মস্তিষ্ক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপ সবই বাইরে থেকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তবু আমি আমার বিশ্বাসে অটল থাকলাম। আমি জানি, বুলা মারা গেলে আমি যে নিঃসঙ্গতায় ডুবে যাব, সেখান থেকে কেউ আমাকে টেনে তুলতে পারবে না। বুলার জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যেই বুলাকে বাঁচানো দরকার।

এক সপ্তাহ আগে বুলা এই মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে এখন পর্যন্ত হাসপাতালে অচেতন হয়ে আছে। দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের যতটুকু চিকিৎসা হওয়া দরকার, বুলাকে তার থেকে অনেক বেশি সুযোগ দেয়া হয়েছে। আমার অনুরোধে বিশেষ একটি সার্জন-রবোটকে পর্যন্ত বিশেষ বিমানে আনা হয়েছিল এবং সেটি অপারগতা জানিয়েছে। তিন দিনের বেশি কাউকে কৃত্রিম দৈহিক ব্যবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার নিয়ম নেই। কিন্তু আমার অনুরোধে বুলা এক সপ্তাহ যাবৎ কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন আর তরল খাদ্যসার নিয়ে বেঁচে আছে। এখনো তার জ্ঞান হয় নি, ডাক্তাররা বলেছেন, জ্ঞান হবে না। যেই মুহূর্তে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস বা রক্তসঞ্চালন বন্ধ করে দেয়া হবে, ঠিক তক্ষুণি তার মৃত্যু ঘটবে। বলা বাহুল্য, আমি বিশ্বাস করি নি।

একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর ব্যাঙ্কে যে-পরিমাণ টাকা থাকা দরকার আমার টাকা তার থেকে অনেক বেশি। মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট তৈরির পদ্ধতি বিক্রয় করে আমি এই অস্বাভাবিক অঙ্কের টাকা পেয়েছিলাম। আমি ব্যাঙ্ক থেকে আমার সব টাকা তুলে নিলাম। সে-টাকা দিয়ে প্রথমে কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের পুরো সেট, কৃত্রিম রক্তসঞ্চালনের নিওক্লিও পাম্প, জীবনরক্ষাকারী প্লাজমা জ্যাকেট ইত্যাদি কিনে বাসায় বুলার জন্যে একটি জীবাণুনিরোধক ঘর প্রস্তুত করলাম। তারপর হাসপাতাল থেকে বুলাকে বিশেষ ব্যবস্থায় বাসায় নিয়ে এলাম। এর পরের দিনই তার কৃত্রিম দৈহিকব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়ার কথা। ডাক্তাররা বুলার জীবনরক্ষার জন্যে এই অহেতুক অকাতর টাকা ব্যয় করতে দেখে একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন, বুলা আগামী ছয় মাস থেকে এক বছর প্লাজমা জ্যাকেটে উষ্ণ দেহে শুয়ে থাকবে সত্যি, কিন্তু জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে এরকম কোনো আশা নেই। বলা বাহুল্য, আমি তবু আমার একরোখা বিশ্বাসে অবিচল থাকতাম।

আমার মনে একটি ক্ষোভ জন্মেছিল। বুলা যদি দেশের একজন সাধারণ নাগরিক না হয়ে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত, তা হলে তাকে বাঁচানোর আরও অনেক চেষ্টা করা হত। সে যতটুকু বাড়তি চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে, সেটিও আমার স্ত্রী হিসাবেই। বুলা দেশের কাছে একজন সাধারণ নাগরিক, কিন্তু আমার কাছে অনেক কিছু, আমার ছেলে টোপনের কাছেও। বলতে দ্বিধা নেই, এই ধরনের আবেগে ব্যাকুল হয়ে উঠতে আমার এতটুকু লজ্জা করছিল না।

অচেতন বুলার নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি প্রথম দুটি দিন কাটিয়ে দিলাম। বুলা সুন্দরী, কিন্তু কাচের গোলকে এই অসহায় সমর্পণের ভঙ্গিতে

তার ফর্সা মুখ যেভাবে স্থির হয়ে ছিল, দেখতে গিয়ে আমি প্রথমবারের মতো তার অস্বাভাবিক সৌন্দর্য অনুভব করলাম। কালো চুলের বন্যায় তার নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠত। আমার বড় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হত, বুলা এক্ষুণি জেগে উঠবে, তারপর আমার চোখে চোখ রেখে হাসবে, গত দশ দিন আমি যেটি দেখি নি, ডাক্তাররা বলেছেন, সেটি আমি আর কোনোদিন দেখব না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ, বিশেষত অস্ত্রোপচারে অভিজ্ঞ সার্জন-রবোট সাধারণ মানুষ কিনতে পারে না। সরকারি নিয়ন্ত্রণে এগুলি বিভিন্ন হাসপাতাল এবং রিসার্চ সেন্টারে কাজ করে। আমি বিশেষ উপায়ে এই নিয়ম ভঙ্গ করে একটি সর্বশেষ মডেলের সার্জন-রবোট কিনে আনলাম। সেটির নাম রু-টেক।

বুলাকে নিয়ে আমি কী করতে যাচ্ছি বুঝিয়ে বলার পর রু-টেক অনেকক্ষণ ফটোসেলের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর খানিকটা দ্বিধান্বিত স্বরে বলল, কিন্তু এর সফলতার সম্ভাবনা শতকরা মাত্র দশমিক শূন্য শূন্য শূন্য পাঁচ।

সম্ভাবনা শূন্য হলেও আমি বুলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব।

অহেতুক পরিশ্রম হবে না কি? একটি সাধারণ মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে এত কিছু করার প্রয়োজন আছে?

আছে। তুমি বোধশক্তিহীন রবোট, তাই একজন সাধারণ মেয়ে আমার কাছে কতটুকু হতে পারে বুঝতে পারছ না।

রবোট রু-টেক শেষ পর্যন্ত এই জটিল অস্ত্রোপচার শুরু করল। আমি পাশে দাঁড়িয়ে ওকে নির্দেশ দিই, কখনো কখনো নিজেও হাতে চাকু তুলে নিই। টোপনকে অস্ত্রোপচারের শুরুতেই নার্সারি স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। যাবার সময় বুলার কাছে যাবার জন্য খুব কাঁদছিল, আমি ধমক দিয়ে নিরস্ত করেছি।

সারা বাসায় আমরা তিনজন। প্লাজমা জ্যাকেটে অচেতন বুলা, তার মাথার পাশে দুটি যন্ত্র; একটি রু-টেক, যে যন্ত্র হয়ে জন্মেছে, আরেকটি আমি, যে বুলাকে বাঁচানোর জন্যে যন্ত্র হয়েছি, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছি। ঘড়ির কাঁটা টিক্‌টিক্ করে সময়কে বয়ে নিয়ে চলল। সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা একটির পর একটি দিনকে আমার অজান্তে জীবন থেকে খরচ করে ফেলতে লাগল, আর বদ্ধ ঘরে আমি বুলার মাথার উপর রু-টেককে নিয়ে এক জটিল অস্ত্রোপচার করতে থাকলাম। মাঝে মাঝে অস্ত্রোপচার করতে করতে ক্লান্তিতে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে, হাত অবশ হয়ে কাঁপতে থাকে, আমি কাঁচি নামিয়ে রেখে মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। রু-টেকের ডাক শুনে একসময় উঠে টলতে টলতে আবার বুলার মাথার সামনে ঝুঁকে পড়ি।

এই অমানুষিক পরিশ্রম আর কেউ করতে পারত না, কিন্তু তবু আমি করে যাচ্ছিলাম, কারণ আমি জানি বুলা আবার বেঁচে উঠবে। আমার একরোখা বিশ্বাস এখন শুধু বিশ্বাস নয়, এটি এখন নিশ্চিত সত্য। আমি জানি আর দেরি নেই, অচেতন বুলা আবার চোখ মেলে তাকাবে।

তারপর সত্যি একদিন রু-টেক হাতের কাঁচি নামিয়ে রেখে আমার দিকে

তাকাল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কাজ শেষ, স্যার।

চমৎকার। কথা বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে উঠল। বুলার মুখের উপর থেকে ঢাকনা সরিয়ে আমি তার উপর ঝুঁকে পড়লাম। তারপর আলতোভাবে ওর কপাল স্পর্শ করে ডাকলাম, বুলা, বুলা—

খুব ধীরে ধীরে বুলা চোখ খুলে আমার দিকে তাকাল, অনিশ্চিতভাবে। তারপর তাকিয়ে রইল।

বুলা।

বুলার চোখে প্রশ্ন জমে উঠল, কিন্তু কোনো কথা বলল না। আমি আবার ডাকলাম, বুলা, বুলা—

বুলা তবু কোনো কথা বলল না। কী করে বলবে? ওর কোনো স্মৃতি নেই। মস্তিষ্কে তীব্র আঘাত পেয়ে ও সব ভুলে গেছে। ওর কিছু মনে নেই—একটি কথাও নয়।

রু–টেককে আমি বিদায় দিচ্ছিলাম। বাসার সামনে তাকে নেয়ার জন্যে একটি স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, রু–টেক, তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার সাহায্য ছাড়া কখনো বুলাকে বাঁচাতে পারতাম না।

রু–টেক মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ধন্যবাদ।

এই প্রতিভাধর রবোটটি সত্যি ভীষণ সাহায্য করেছে। কিন্তু তবুও আমি ওকে খুব তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিচ্ছিলাম। দরকার ছাড়া কোনো রবোট আমি বাসায় রাখতে চাই না, বুলার এই মানসিক অবস্থাতে তো একেবারেই নয়।

রু–টেক আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরের দিকে পা দিতেই আমি ডাকলাম, শোন।

বলুন।

এখানে তুমি যা যা করেছ সব ভুলে যাবে।

কেন, স্যার?

কারণ আছে। আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, তুমি কাউকে কিছু বলবে না, সব ভুলে যাবে। ভুলে যাও.....

রবোটকে মানুষের কথা মানতে হয়। তাই কপেট্রনে বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে রু–টেক তার সব স্মৃতি ধ্বংস করে ফেলল।

বুলার স্মৃতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, আমি তাকে সব নূতন করে শেখাচ্ছি—একেবারে গোড়া থেকে। বুলা অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার কথা শোনে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, আশ্চর্য। আমার একটুও মনে নেই।

আমি তাকে তার ছেলেবেলার গল্প করলাম। একসময় সেগুলি তার মুখেই শুনেছিলাম। তারপর তার ছাত্রজীবনের গল্প করে শোনালাম, ব্যক্তিগত ডাইরি, কিছু চিঠিপত্র খুব কাজে দিল। শেষে তার সাথে আমার বিয়ের পুরো ঘটনাটি বললাম। শুনতে শুনতে ও লজ্জা পেল, হাসল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, কী বোকা ছিলাম!

সবশেষে ওকে ওর অ্যাকসিডেন্টের ঘটনাটি শোনালাম। ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনে গেল। ডাক্তারদের অপারগতার কথা শুনতে শুনতে ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

আমার একরোখা বিশ্বাস আর জোর করে বাঁচিয়ে তোলার ঘটনা শুনতে শুনতে ওর চোখ কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে বলে, কেন বাঁচালে আমাকে?

বাঃ! তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব কেমন করে?

বুলা সরলভাবে হাসে। বলে, ভাগ্যিস তুমি ছিলে, নইলে কবে মরে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম!

আমার সবরকম পরামর্শ শুনে শুনে ও ঠিক আগের বুলা হয়ে উঠতে থাকে। একদিন টেপ রেকর্ডারে ওর দুর্ঘটনার আগে টেপ করে রাখা গান শুনে বুলা অবাক হয়ে যায়। বলে, আমি নিজে গেয়েছিলাম?

হ্যাঁ। তুমি চমৎকার গান গাইতে পারতে। এখনও নিশ্চয়ই পার।

যাঃ!

সত্যি। চেষ্টা করে দেখ। গাও দেখি—

বুলা প্রথমে একটু লজ্জা পায়, তারপর চমৎকার সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে।

একদিন হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আমি কি আগের থেকে খুব বদলে গেছি?

তা তো গিয়েছ অল্প কিছু। এত বড় একটা দুর্ঘটনা—

আমাকে শুধরে দিও, আমি ঠিক আগের মতো হতে চাই।

বেশ। আমি বুলাকে খুঁটিনাটি সব বিষয় শুধরে দিই—আর ও ঠিক আগের বুলা হয়ে উঠতে থাকে।

একদিন ওকে আমি টৌপনের কথা বললাম। ও অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চোখ বড় বড় করে শুনল, তারপর ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করল, আমার ছেলে?

হ্যাঁ, আমাদের ছেলে।

সত্যি বলছ? আমার—মানে আমার নিজের ছেলে?

হ্যাঁ, তোমার নিজের ছেলে।

ওর নাম কি? কী রকম দেখতে? কত বড়?

আস্তে! আস্তে! আমি বুলাকে শান্ত করি, দেখতেই তো পাবে।

কখন দেখব? কোথায় আছে?

নার্সারি স্কুলে। কাল নিয়ে আসব।

না না, কাল নয়, এক্ষুণি নিয়ে এস। কত বড়? কি নাম?

পাঁচ বছর বয়স। টৌপন নাম।

টৌপন?

হ্যাঁ।

আমাকে দেখলে চিনতে পারবে?

বাঃ! মাকে বুঝি ছেলেরা চিনতে পারে না!

সত্যি চিনতে পারবে তো? আমি যে চিনি না। বুলার কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে ওঠে।

আমি সান্ত্বনা দিই, তাতে কী হয়েছে, একবার দেখলেই চিনে ফেলবে, আর কখনো ভুলবে না।

তুমি নিয়ে এস। বুলা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর হাত আঁকড়ে ধরে বলে, আমার ছেলেকে দেখব।

তবু আমি দেরি করতে থাকি, আর চোখের সামনে বুলা মা হয়ে উঠে টৌপনের

জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

টোপনকে নিয়ে আসার পর সে তার মাকে দেখে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে বুলার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুলার বুকে মুখ গুঁজে জড়িত স্বরে আমার বিরুদ্ধে একরাশ নালিশ করতে থাকে, আমি কীভাবে তাকে তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছি বলতে বলতে তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। বুলা বিস্ফারিত চোখে টোপনকে আঁকড়ে ধরে, তারপর ফিসফিস করে বলে, কী আশ্চর্য! আমার ছেলে! আমার নিজের ছেলে।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

দীর্ঘ দু' বছর সময়ে বুলা ধীরে ধীরে আগের বুলা হয়ে ওঠে। ও এখন ঠিক আগের মতো গান গাইতে পারে, ঠিক আগের মতো হাসে, আগের মতো হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সব কবিতার লাইন আউড়ে ওঠে। সারাদিন পরিশ্রম করে ফিরে এলে ও গভীর মমতায় আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাকিয়ে থাকে। দুঃস্বপ্নের মতো অসহায় অচেতন স্মৃতিহারা বুলাকে আমি দ্রুত ভুলে যেতে থাকি।

ও এখন ঠিক আগের বুলা হয়ে উঠেছে—শুধু একটি বিষয় ছাড়া। ওকে আমি বিজ্ঞানবিষয়ক একটি অক্ষরও শেখাই নি। কেন জানি আমার ধারণা হয়েছে, নিষ্ঠুর বিজ্ঞান বুলার জন্যে নয়, বুলা অফুরন্ত মমতার উৎস—ভালবাসার ধারা।

সেদিন টোপন, ওর বয়স এখন সাত, এসে বলল, ওদের স্কুলে বিজ্ঞানমেলা। আমাকে আর বুলাকে যেতে হবে। আমার অনেক কাজ, স্কুলের ছেলেমানুষি বিজ্ঞানমেলায় যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, বুলা যাক, সেটিও আমার ঠিক ইচ্ছে নয়। কিন্তু টোপনকে সে-কথা বোঝাবে কে? টোপন বহু আগে থেকেই তার মার কাছে অনেক গল্প করে রাখল।

আমরা নিজেরা টেলিস্কোপ তৈরি করেছি। মঙ্গল গ্রহের দুটো চাঁদই সেটা দিয়ে দেখা যায়।

সত্যি?

হ্যাঁ। একটা ডিমোস, আরেকটার নাম ফোবোস।

বাঃ। বুলা ওকে উৎসাহ দেয়।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপও তৈরি করেছি।

যাঃ!

সত্যি। বিশ্বাস কর। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে একটা রবোট। তুমি গেলে তোমার সাথেও কথা বলবে। সেখানে ভিড় সবচেয়ে বেশি—তবু তোমাকে ঠিক আমি নিয়ে যাব। আমি আবার ক্যাপ্টেন কিনা।

কাজেই বুলাকে টোপন বিজ্ঞানমেলায় নিয়ে গেল। আমি গেলাম অফিসে, মনে খানিকটা অস্বস্তি কেন জানি খচখচ করতে লাগল।

সন্ধেয় ফিরে এসে দেখলাম বাসা অন্ধকার। একটু অবাক হয়ে সিঁড়ি বেয়ে শোবার ঘরে হাজির হলাম। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেখলাম, জানালার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে

আছে।

কে?

কোনো কথা না-বলে মূর্তিটি খুব ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, সেটি বুলা। পরনের কাপড় অবিন্যস্ত, চুল এলোমেলো। দু' চোখ টকটকে লাল আর গাল বেয়ে চোখের পানির শুকনো ধারা। আমি বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, বুলা, কী হয়েছে?

বুলা পাথরের মতো চুপ করে রইল। আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

বুলা! আমি আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলাম।

সে হঠাৎ তীব্র দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, তুমি মিথ্যা কথা বললে কেন?

কি?

তুমি বলেছ আমি বুলা, আসলে আমি একটা রবোট। তারপর ও হঠাৎ আকুল হয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—আমার এত চেষ্টার পরও বুলা সব জেনে গেছে। হঠাৎ কেন জানি অসহায় বোধ করলাম, আমার কিছু করার নেই। বুলার ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক বদলে আমি একটি কপেট্রন লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ওর মস্তিষ্ক কোনোভাবেই সারানো যেত না, তাই আমি এই বিকল্পটি বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যিই তো ও বুলা হয়েছিল। গভীর বেদনায় আমার বুক টনটন করে ওঠে। আমি ডাকলাম, বুলা।

বুলার চোখ ধক করে জ্বলে উঠল। বলল, বল রবোট!

না—আমি চিৎকার করে উঠলাম। বুলা, পাগল হয়ো না। আমার কথা শোন। তোমায় কে বলেছে তুমি রবোট?

টোপনের বিজ্ঞানমেলায় একটা মেটাল ডিটেকটর ছিল, বুলা কান্না সামলে বলতে থাকে, আমি কাছে যেতেই সেটি টিকটিক করে উঠল। তারপর আমি গিয়েছি কপেট্রনের ফার্মে। ওরা বলেছে, আমার মাথায় মস্তিষ্ক নেই, তার বদলে পারমাণবিক ব্যাটারিসহ একটা কপেট্রন কাজ করছে।

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। তারপর বললাম, তাতে ক্ষতি হয়েছে কি? তুমি কাঁদছ কেন?

তবে কি হাসব? আনন্দে চিৎকার করব? বুলা কান্না সামলাতে সামলাতে বিকৃত স্বরে বলল, কী আশ্চর্য! আমি তুচ্ছ একটা রবোট, অথচ আমি ভাবছি আমি বুলা, টোপনের মা, তোমার স্ত্রী—বুলা কান্নার বেগ সামলাতে ঠোঁট কামড়ে ধরল।

আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। এত কষ্ট করে বুলার দেহে আমি আবার বুলাকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। আমার সামনেই তা আবার ধ্বংস হয়ে যাবে? আমি বুলাকে দু' হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম, তারপর চিৎকার করে ডাকলাম, বুলা।

কি? ওর সারা মুখ চোখের পানিতে ভেসে যাচ্ছে।

শোন বুলা, তুমি যদি এখনও এরকম কর—আমি তীব্র স্বরে বললাম, তা হলে এক্ষুনি তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলব।

বুলা বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে আমার দিকে তাকাল।

হ্যাঁ। তোমাকে অজ্ঞান করে আবার তোমার মাথায় নূতন কপেট্রন বসাব, আবার

নূতন করে তোমার মাঝে বুলাকে ফিরিয়ে আনব...

বুলা বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বলে চললাম, তোমাকে আমার চাই–ই চাই। তোমার জন্যে শোন বুলা, শুধু তোমার জন্যে আমি তোমার ধ্বংস হয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক বদলে নূতন কপোট্রন বসিয়েছি। তোমার ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, ভালবাসা আছে। তোমার টোপন আছে, আমি আছি—তবু তুমি এরকম করছ?

তুমি বুকে হাত দিয়ে বল, তোমার বুকে আমার জন্য ভালবাসা নেই? টোপন তোমার ছেলে না? থাকুক তোমার মাথায় কপোট্রন। মানুষ কৃত্রিম চোখ, কৃত্রিম হাত–পা, ফুসফুস নিয়ে বেঁচে নেই? তবে কেন পাগলামি করছ?

কথা বলতে বলতে আমার সব আবেগ স্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে লাগল। কে জানত আমার ভিতরে এত আবেগ লুকিয়ে ছিল।

তোমার নিজেকে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ, তুমি বুলা কি না। বুলার চোখ, মুখ, হাত, পা, চুল—সবকিছু বুলার, শুধু তোমার মস্তিষ্কটি কৃত্রিম, তাতে যে–অনুভূতি, সেটি পর্যন্ত বুলার, আমি নিজের হাতে ধীরে ধীরে তৈরি করেছি। তবু তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ।

আমার কী স্বার্থ? তোমাকে প্রাণ দেয়ার আমার কী স্বার্থ? রবোটের সাহায্যে তোমার মস্তিষ্ক বদলে মানবিক আবেগসম্পন্ন কপোট্রন তৈরি করে সেখানে বসানোতে আমার কী স্বার্থ? শুধু তোমাকে পাওয়া—তোমাকে তোমাকে তোমাকে...

আমি বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে বুলাকে তীব্র ঝাঁকুনি দিতে লাগলাম।

বুলা আমার বুকে মাথা গুঁজে বলল, তাহলে আমিই বুলা?

হ্যাঁ, তুমিই বুলা। পৃথিবীতে আর কোনো বুলা নেই।

টোপন আমার ছেলে?

হ্যাঁ। টোপন তোমার ছেলে, তোমার আর আমার।

তুমি আমার—

আমি তোমার?

বুলা উত্তর না দিয়ে হাসল। আমি ওর চুলে হাত বোলাতে লাগলাম। এই চুলের আড়ালে বুলার মাথায় একটি কপোট্রন লুকানো আছে। কিন্তু ক্ষতি কি? এই কপোট্রন আমাকে ভালবাসে, টোপনকে স্নেহ করে, আনন্দে হাসে, দুঃখ পেলে কাঁদে। হলই–বা কপোট্রন।

আমি বুলাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলাম।

কপোট্রনিক ভবিষ্যৎ

বিকেলে আমার হঠাৎ করে মনে হল আজ আমার কোথায় জানি যাবার কথা। ভোরে বারবার করে নিজেকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর মনে করতে পারছি না। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, তবে বিশেষ চিন্তিত হলাম না। আমি ঠিক জানি, আমার মস্তিষ্কও কপোট্রনের মতো পুরানো স্মৃতি হাতড়ে দেখতে শুরু

করেছে, মনে করার চেষ্টা না করলেও ঠিক মনে হয়ে যাবে।

বৈকালিক চা খাওয়ার সময় আমার মনে পড়ল আজ সন্ধ্যেয় একটি কপেট্রন প্রস্তুতকারক ফার্মে যাবার কথা। ডিরেক্টর ভদ্রলোক ফোন করে বলেছিলেন, তাঁরা কতকগুলি নিরীক্ষামূলক কপেট্রন তৈরি করেছেন, আমি দেখলে আনন্দ পাব। কিছুদিন আগে এই ডিরেক্টরের সাথে কোনো-এক বিষয়ে পরিচয় ও অল্প কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এখন মাঝে মাঝেই নূতন রবোট তৈরি করলে আমাকে ফোন করে যাবার আমন্ত্রণ জানান।

ফার্মটি শহরের বাইরে, পৌঁছুতে একটু দেরি হয়ে গেল। লিফটে করে সাততলায় ডিরেক্টরের ঘরে হাজির হলাম। তিনি খানিকক্ষণ শিষ্টতামূলক আলাপ করে আমাকে তাঁদের রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম সদ্যপ্রস্তুত ঝকঝকে কতকগুলি রবোট দেখব, কিন্তু সেরকম কিছু না। বিরাট হলঘরের মতো ল্যাবরেটরিতে ছোট ছোট কালো টেবিলের উপর কাঁচের গোলকে কপেট্রন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একপাশে একটি প্রিন্টিং মেশিন, অপর পাশে মাইক্রোফোন, প্রশ্ন করলে উত্তর বলে দেবে কিংবা লিখে দেবে। দেয়ালে কিছু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চৌকোণা ট্রান্সফর্মার, দেখে মনে হল এখান থেকে উচ্চচাপের বৈদ্যুতিক প্রবাহ দেয়া হয়। কপেট্রনের সামনে লম্বাটে মাউথপীস। ঠিক একই রকম বেশ কয়টি কপেট্রন পাশাপাশি সাজানো। আমি জিজ্ঞাসু চোখে ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, রবোটের শরীরের সাথে এখনও জুড়ে দিই নি,—দিতে হবেও না বোধহয়।

কেন?

এই কপেট্রনগুলি স্বাভাবিক নয়। সব কপেট্রনই কিছু কিছু যুক্তিতর্ক মেনে চলে। এগুলির সেরকম কিছু নেই।

মানে? ওরা তাহলে আবোল-তাবোল বকে?

অনেকটা সেরকমই। ভদ্রলোক হাসলেন। ওদের কল্পনাশক্তি অস্বাভাবিক। ঘোর অযৌক্তিক ব্যাপারও বিশ্বাস করে এবং সে নিয়ে রীতিমতো তর্ক করে।

এগুলি তৈরি করে লাভ? এ তো দেখছি উন্মাদ কপেট্রন!

তা, উন্মাদ বলতে পারেন। কিন্তু এদের দিয়ে কোনো লাভ হবে না জোর দিয়ে বলা যায় না। বল্গা ছাড়া ভাবনা যদি না করা হত, পদার্থবিদ্যা কোনোদিন ক্লাসিক্যাল থেকে রিলেটিভিস্টিক স্তরে পৌঁছুত না।

তা বটে। আমি মাথা নাড়লাম। কিন্তু তাই বলে ইচ্ছে করে পাগল কপেট্রন তৈরি করবেন?

আপনি আলাপ করে দেখুন না, আর কোনো লাভ হোক কি না-হোক, নির্ভেজাল আনন্দ তো পাবেন।

আমি একটা কপেট্রনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি হে?

নাম? নামের প্রয়োজন কী? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকলে নামের প্রয়োজন হয় না—যন্ত্রণা দিয়ে পরিচয় পাওয়া যায়। লাল নীল যন্ত্রণারা রক্তের ভিতর খেলা করতে থাকে......

সাহিত্যিক ধাঁচের মনে হচ্ছে? আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম।

হ্যাঁ। এটি সাহিত্যমনা। একটা-কিছু জিজ্ঞেস করুন।

আমি কপেট্রনটিকে জিজ্ঞেস করলাম, যন্ত্রণারা আবার লাল নীল হয় কেমন

করে?

যন্ত্রণারা সব রংয়ের হতে পারে, সব গন্ধের হতে পারে, এমনকি সবকিছুর মতো হতে পারে। যন্ত্রণার হাত-পা থাকে, চোখ থাকে-ফুরফুরে প্রজাপতির মতো পাখা থাকে। সেই পাখা নাড়িয়ে যন্ত্রণারা আরো বড় যন্ত্রণায় উড়ে বেড়ায়। উড়ে উড়ে যখন ক্লান্তি নেমে আসে, তখন—

তখন?

তখন একটি একটি লাল ফুলের জন্ম হয়। সব নাইটিংগেল তখন সবগুলো ফুলের কাঁটায় বুক লাগিয়ে রক্ত শুষে নেয়—লাল ফুল সাদা হয়ে যায়, সাদা ফুল লাল...

বেশ বেশ। আমি দ্রুত পাশের কপেট্রনের কাছে সরে এলাম।

এটিও কি ওটার মতো বদ্ধ পাগল?

না, এটা অনেক ভালো। এটি আবার বিজ্ঞানমনা। যুক্তিবিদ্যা ছাড়া তো বিজ্ঞান শেখানো যায় না, কাজেই এর অল্প কিছু যুক্তিবিদ্যা আছে। তবে আজগুবি আজগুবি সব ভাবনা এর মাথায় খেলতে থাকে।

আমি কপেট্রনটির পাশে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, বলতে পার বিজ্ঞান-সাধনা শেষ হবে কবে?

এই মুহূর্তে হতে পারে। একটু চেষ্টা করলেই।

আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, তবে না বলছিলেন এটা যুক্তিপূর্ণ কথা বলবে?

ওর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করতে বলুন দেখি।

আমি কপেট্রনটিকে বললাম, বিজ্ঞান-সাধনা শেষ হওয়া আমি দর্শন বা অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি নি। আমি সাদা কথায় জানতে চাই বিজ্ঞান-সাধনা বা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন কবে শেষ হবে?

বললাম তো, ইচ্ছে করলে এখনই।

কীভাবে?

ভবিষ্যতের শেষ সীমানা থেকে টাইম মেশিনে চড়ে কেউ যদি আজ এই অতীতে ফিরে আসে, আর তাদের জ্ঞান-সাধনার ফলটুকু বলে দেয়, তা হলেই তো হয়ে যায়। আর কষ্ট করে জ্ঞান-সাধনা করতে হয় না।

আমি বোকার মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, কিন্তু আমরা কী করতে পারি? ভবিষ্যৎ থেকে কেউ যদি না আসে?

নিশ্চয়ই আসবে। কপেট্রনটি যুক্তিহীনভাবে চেঁচিয়ে উঠল। ভবিষ্যতের লোকেরা নিশ্চয়ই বর্তমান কালের জ্ঞানের দুরবস্থা অনুভব করবে। এর জন্যে কাউকে-না-কাউকে জ্ঞানের ফলসহ না পাঠিয়ে পারে না।

সেই আশায় কতকাল বসে থাকব?

লক্ষ বছর বসে থেকেও লাভ নেই। অথচ পরিশ্রম করলে এক মাসেও লাভ হতে পারে।

কি রকম?

যারা ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে আসবে তারা তাদের কাল থেকে নিঃসময়ের রাজত্বে ঢুকবে নিজেদের যান্ত্রিক উৎকর্ষ দিয়ে, কিন্তু নিঃসময়ের রাজত্ব থেকে

বর্তমানকালে পৌঁছুবে কীভাবে? কে তাদের সাহায্য করবে? পৃথিবী থেকে কেউ সাহায্য করলেই শুধুমাত্র সেটি সম্ভব।

তোমার কথা কিছু বুঝলাম না। নিঃসময়ের রাজত্ব কি?

নিঃসময় হচ্ছে সময়ের সেই মাত্রা, যেখানে সময়ের পরিবর্তন হয় না।

এসব কোথা থেকে বলছ?

ভেবে ভেবে মন থেকে বলছি।

তাই হবে। এ ছাড়া এমন আষাঢ়ে গল্প সম্ভব।

আমি ডিরেক্টর ভদ্রলোককে বললাম, চলুন যাওয়া যাক। আপনার কপেট্রনদের সাথে চমৎকার সময় কাটল। কিন্তু যা-ই বলুন—আমি না বলে পারলাম না, এগুলি শুধু শুধু তৈরি করেছেন, কোনো কাজে লাগবে না।

আমারও তাই মনে হয়। তাঁকে চিন্তিত দেখায়, যুক্তিহীন ভাবনা দিয়ে লাভ নেই।

ফার্ম থেকে বাসায় ফেরার সময় নির্জন রাস্তায় গাড়িতে বসে বসে আমি কপেট্রনটির কথা ভেবে দেখলাম। সে যেসব কথা বলছে, তা অসম্ভব কল্পনাবিলাসী লোক ছাড়া বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটি কি শুধুই কল্পনাবিলাস? কথাগুলোর প্রমাণ নেই, কিন্তু যুক্তি কি একেবারেই নেই? আমি ভেবে দেখলাম, ভবিষ্যৎ থেকে কেউ এসে হাজির হলে মানবসভ্যতা এক ধাপে কত উপরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু কপেট্রনের ঐ নিঃসময়ের রাজত্বটাজত্ব কথাগুলি একেবারে বাজে, শুধু কল্পনা করে কারো এরকম বলা উচিত না, তবে ব্যাপারটি কৌতূহলজনক। সত্যি সত্যি একটু ভেবে দেখলে হয়।

পরবর্তী কয়দিন যখন আমি অতীত, ভবিষ্যৎ, চতুর্মাত্রিক জগৎ, আপেক্ষিক তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম, তখন মাঝে মাঝে আমার নিজেরই লজ্জা করত, একটি ক্ষ্যাপা কপেট্রনের কথা শুনে সময় নষ্ট করছি ভেবে। এ বিষয় নিয়ে কেন জানি আগে কেউ কোনোদিন গবেষণা করে নি। সময়ে পরিভ্রমণ সম্পর্কে আমি মাত্র একটি প্রবন্ধ পেলাম এবং সেটিও ভীষণ অসংবদ্ধ। বহু পরিশ্রম করে উন্নতশ্রেণীর কয়েকটি কম্পিউটারকে নানাভাবে জ্বালাতন করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল। সেগুলি হচ্ছে, প্রথমত উপযুক্ত পরিবেশে সময়ের অনুকূল কিংবা প্রতিকূলে যাত্রা করে ভবিষ্যৎ কিংবা অতীতে যাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়ত, সময়ের স্রোতে যাত্রার পূর্বমুহূর্তে ও শেষমুহূর্তে অচিন্ত্যনীয় পরিমাণ শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন। সেই মুহূর্তে শক্তিক্ষয় নিয়ন্ত্রণ না করলে পুরো যাত্রা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এবং তৃতীয়ত, যাত্রার পূর্ব ও শেষমুহূর্তের মধ্যবর্তী সময় স্থির সময়ের ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে পরিভ্রমণে কোনো শক্তির প্রয়োজন নেই।

আমি ভেবে দেখলাম, উন্মাদ কপেট্রনটি যা বলেছিল, তার সাথে এই সিদ্ধান্তগুলির খুব বেশি একটা অমিল নেই। প্রথমবারের মতো কপেট্রনটির জন্য আমার একটু সম্ভ্রমবোধের জন্ম হল।

এরপর আমার মাথায় ভয়ানক ভয়ানক সব পরিকল্পনা খেলা করতে লাগল। যেসব ভবিষ্যতের অভিযাত্রীরা অতীতে আসতে চাইছে আমি তাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। নিঃসময়ের ক্ষেত্র থেকে বর্তমানে পৌঁছুতে যে-শক্তিক্ষয় হয় তা নিয়ন্ত্রণের যান্ত্রিক কলাকৌশল আমার মাথায় উঁকি দিতে লাগল। এই সময়-স্টেশনটি

তৈরি করতে কী ধরনের রবোটের সাহায্য নেব মনে মনে স্থির করে নিলাম।

যে-উন্মাদ কপেট্রনটির প্ররোচনায় আমি এই কাজে নেমেছি, তার সাথে আবার দেখা করতে গিয়ে শুনলাম সেটিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। যারা যুক্তিহীন ভাবনা ভালবাসে তারা নাকি প্রকৃত অর্থেই অপদার্থ। শুনে আমার একটু দুঃখ হল।

যেহেতু সময়ে পরিভ্রমণ বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃত নয় এবং এ বিষয়ে গবেষণার জন্য সরকারি সাহায্যের কোনো আশা নেই, সেহেতু আমি এই সময়-স্টেশনটি বাসাতেই স্থাপন করব ঠিক করলাম। যান্ত্রিক কাজে পারদর্শী দুটি রবোট নিয়ে এসে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করলাম। পুরো পরিকল্পনা আমার নিজের চিন্তাপ্রসূত এবং ব্যাপারটি যে-কোনো বিষয় থেকে জটিল। কাজ শেষ হতে এক মাসের বেশি সময় লাগল। টোপন দিনরাত সব সময় স্টেশনের পাশে বসে থাকত। এটা দিয়ে ভবিষ্যতের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা হবে শুনে সে অস্বাভাবিক কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। কোন সুইচটি কোন কাজে লাগবে এবং কোন লিভারটি কিসের জন্যে তৈরি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে তার কোনো ক্লান্তি ছিল না।

পরীক্ষামূলকভাবে যেদিন সময়-স্টেশনটি চালু করলাম, সেদিন টোপন আমার পাশে বসে। উত্তেজনায় সে ছটফট করছিল। তার ধারণা, এটি চালু করলেই ভবিষ্যতের মানুষেরা টুপটাপ করে হাজির হতে থাকবে।

একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনির সাথে সাথে দুটি লালবাতি বিপবিপ করে জ্বলতে লাগল। সামনে নীলাভ স্ক্রীনে আলোকতরঙ্গ বিচিত্রভাবে খেলা করছিল। আমি দুটি লিভার টেনে একটা সুইচ টিপে ধরলাম, একটা বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ হল, এখন স্থির সময়ের ক্ষেত্রের সাথে এই জটিল সময়-স্টেশনটির যোগাযোগ হবার কথা। সেখানে কোনো টাইম মেশিন থাকলে বড় স্ক্রীনটাতে সংকেত পাব। কিন্তু কোথায় কি? বসে থাকতে থাকতে আমার বিরক্তি ধরে গেল, বড় স্ক্রীনটিতে এতটুকু সংকেতের লক্ষণ পাওয়া গেল না।

পাশে বসে থাকা টোপনকে লক্ষ করলাম। সে আকুল আগ্রহে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আছে, উত্তেজনায় বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। সে প্রতি মুহূর্তে আশা করছে এক্ষুনি একজন ভবিষ্যতের মানুষ লাফিয়ে নেমে আসবে। তাকে দেখে আমার মায়া হল, জিজ্ঞেস করলাম, কি রে টোপন, কেউ যে আসে না!

আসবে বাবা, আসবে। তাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখাল।

কেউ যদি আসে, তা হলে তাকে তুই কী বলবি?

বলব, গুড মর্নিং। সে স্ক্রীন থেকে চোখ সরাল না, পাছে ভবিষ্যতের মানুষ সেই ফাঁকে স্ক্রীনে দেখা দিয়ে চলে যায়।

আচ্ছা বাবা, আমার যদি একটা টাইম মেশিন থাকে—

হুঁ।

তা হলে আমি অতীতে যেতে পারব?

কেন পারবি না। অতীত ভবিষ্যৎ সব জায়গায় যেতে পারবি।

অতীতে গিয়ে আমার ছেলেবেলাকে দেখব?

দেখবি।

আমি যখন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতাম, তখনকার আমাকে দেখব?

দেখবি।

আচ্ছা বাবা, অতীতে গিয়ে আমি যদি আমার হামা-দেয়া আমাকে মেরে ফেলি তাহলে আমি এখন কোত্থেকে আসব?

আমি চুপ করে থাকলাম। সত্যিই তো! কেউ যদি অতীতে গিয়ে নিজেকে হত্যা করে আসে, তাহলে সে আসবে কোত্থেকে? অথচ সে আছে, কারণ সে নিজে হত্যা করেছে! এ কী করে সম্ভব? আমি ভেবে দেখলাম, এ কিছুতেই সম্ভব না—কাজেই অতীতে ফেরাও সম্ভব না। টাইম মেশিনে করে ভবিষ্যতের মানুষ অতীতে ফিরে আসবে, এসব কল্পনাবিলাস। আমি হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম। একটি উন্মাদ কপেট্রনের প্ররোচনায় এতদিন শুধু শুধু পরিশ্রম করেছি, অকাতরে টাকা ব্যয় করেছি? রাগে দুঃখে আমার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হল। লিভার ঠেলে সুইচ টিপে আমি সময়-স্টেশনটি বন্ধ করে দিলাম।

বাবা, বন্ধ করলে কেন? টোপন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

তোর প্রশ্ন শুনে। তুই যে-প্রশ্নটি করেছিস সেটি আমার আগে মনে হয় নি, তাই।

টোপন কিছু না বুঝে বলল, কি প্রশ্ন?

ঐ যে তুই জিজ্ঞেস করলি, অতীতে নিজেকে মেরে ফেললে পরে কোত্থেকে আসব? তাই অতীতে যাওয়া সম্ভব না, টাইম মেশিন তৈরি সম্ভব না—

টোপনের চোখে পানি টলমল করে উঠল। মনে হল এই প্রশ্নটি করে আমাকে নিরুৎসাহিত করে দিয়েছে বলে নিজের উপর ক্ষেপে উঠেছে। আমাকে অনুনয় করে বলল, আর একটু থাক না বাবা।

থেকে কোনো লাভ নেই। আয় যাই, অনেক রাত হয়েছে।

টোপন বিষণ্নমুখে আমার পিছনে পিছনে আসতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম সময়ে পরিভ্রমণের উপরে কেন এতদিন কোনো কাজ হয় নি। সবাই জানত এটি অসম্ভব। ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে এলে অতীত পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিন্তু বাস্তব জগতের পরিবর্তন—তা অতীতই হোক আর ভবিষ্যৎই হোক, কোনো দিনই সম্ভব নয়। আমি প্রথমে উন্মাদ কপেট্রনটির উপর, পরে নিজের উপর ক্ষেপে উঠলাম। কম্পিউটারগুলিকে কেন যে বাস্তব সম্ভাবনার কথা জিজ্ঞেস করি নি, ভেবে অনুতাপ হল। কিন্তু তাতে লাভ কী আমার, এই অযথা পরিশ্রম আর কোনো দিন ফিরে আসবে না।

টোপন কিন্তু হাল ছাড়ল না। প্রতিদিন আমাকে অনুনয়-বিনয় করে সময়-স্টেশনটি চালু করতে বলত। তাকে কোনো যুক্তি দিয়ে বোঝানো গেল না যে, কোনোদিনই ভবিষ্যতের মানুষ অতীতে আসবে না,—এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। তার অনুনয়-বিনয় শুনতে শুনতে আমাকে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল। আমি আবার সময়-স্টেশনটি চালু করলাম। টোপনকে সুইচপ্যানেলের সামনে বসিয়ে দিয়ে আমি চলে এলাম। আসার সময় সাবধান করে দিলাম, কোনো সুইচে যেন ভুলেও চাপ না দেয়। শুধু বড় স্ক্রীনটার দিকে যেন নজর রাখে। যদি কিছু দেখতে পায় (দেখবে না জানি) তবে আমাকে যেন খবর দেয়।

এই জটিল ও মূল্যবান যন্ত্রটি সাত বছরের একটি ছেলের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে আমার কোনো দ্বিধা হয় নি। আমি জানি, বাচ্চা ছেলেদের ছেলেবেলা থেকে

সত্যিকার দায়িত্ব পালন করতে দিলে তারা সেগুলি মন দিয়ে পালন করে, আর পরে খাঁটি মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। টোপনের সাথে আগেও আমি বেশ গুরুত্ব দিয়ে কথা বলতাম, প্রায় বিষয়েই আমি ওর সাথে এমনভাবে পরামর্শ করেছি, যেন সে একটি বয়স্ক মানুষ। এই সময়-স্টেশনটি তৈরি করার সময়েও কোন লিভারটি কোথায় বসালে ভালো হবে, তার সাথে আলাপ করে দেখেছি।

সারা দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে কাটিয়ে সন্ধেয় বাসায় ফিরে আসতেই বুলা আমাকে বলল, টোপন সারা দিন নাওয়া-খাওয়া করে নি। একমনে সময়-স্টেশনের সামনে বসে আছে। আমি হেসে বললাম, একদিন নাওয়া-খাওয়া না করলে কিছু হয় না।

তুমি তো তাই বলবে! বুলা উষ্ণ হয়ে বলল, নিজে যেরকম হয়েছ, ছেলেটিকেও সেরকম তৈরি করছ!

বেশ, বেশ, টোপনকে খেতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলে আমি সময়-স্টেশনটিতে হাজির হলাম। অতিকায় যন্ত্রপাতির ভিতরে সুইচ প্যানেলের সামনে ছোট্ট টোপন গম্ভীর মুখে বড় স্ক্রীনটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রাখলাম। সে চমকে উঠে বলল, কে?

আমি। কি রে, কিছু দেখলি?

এখনও দেখি নি। তবে ঠিক দেখব। সারা দিন না খেয়ে ওর মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

যা, এখন খেয়ে আয়। ততক্ষণ আমি বসি।

তুমি বসবে? টোপন কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি যাব আর আসব, একছুটে—

একছুটে যেতে হবে না। ধীরেসুস্থে খেয়েদেয়ে আয়। সারা দিনরাত তো আর এখানে বসে থাকতে পারবি না। ঘুমোতে হবে, পড়তে হবে, স্কুলে যেতে হবে, খেলাধুলা করতে হবে।

কয়দিন খেলাধুলা করব না, স্কুল থেকে এসেই এখানে বসব। তারপর পড়া শেষ করে—

বেশ বেশ।

তুমি নাহয় আমাকে শিখিয়ে দিও কীভাবে এটি চালু করতে হয়। তা হলে তোমাকে বিরক্ত করব না।

আচ্ছা আচ্ছা, তাই দেব। এখন খেয়ে আয়।

শেষ পর্যন্ত পুরো সময়-স্টেশনটি টোপনের খেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়াল। সে সময় পেলেই নিজের এসে চালু করে চুপচাপ বসে থাকত, আর যাবার সময় বন্ধ করে চলে যেত। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতাম। টোপনকে জিজ্ঞেস করতাম, কি রে, কিছু দেখলি?

এখনও দেখি নি, তবে ঠিক দেখব। এরই নাম বিশ্বাস। আমি মনে মনে হাসতাম

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। আমি সময়-স্টেশনটির কথা ভুলেই গেছি। মাঝে মাঝে টোপন এসে আমাকে নিয়ে যেত যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখার

জন্যে। খুঁটিনাটি ভুলের জন্যে ভবিষ্যতের মানুষ হাতছাড়া হয়ে গেলে তার দুঃখের সীমা থাকবে না।

সেদিন দুপুরে আমি সবে এক কাপ কফি খেয়ে কতকগুলি কাগজপত্র দেখছি, এমন সময় ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। সহকারী মেয়েটি ফোন ধরে রিসিভারটি আমার দিকে এগিয়ে দিল, আপনার ছেলের ফোন।

আমি রিসিভারে কান পাততেই টোপনের চিৎকার শুনলা, বাবা, এসেছে, এসেছে—এসে গেছে!

কে এসেছে?

ভবিষ্যতের মানুষ! তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।

ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম মানুষ?

এখনও দেখি নি। বড় স্ক্রীনটায় এখন শুধু আলোর দাগ দেখা যাচ্ছে। প্রথমে লম্বা লম্বা থাকে, পরে হঠাৎ ঢেউয়ের মতো হয়ে যায়। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।

সত্যি বলছিস তো? টোপন মিথ্যা বলে না জেনেও জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, ঠিক দেখেছিস তো?

তুমি এসে দেখে যাও, মিথ্যা বলছি না কি। টোপনের গলার স্বর কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়, এতক্ষণে চলেই গেল নাকি!

আমি সহকারী মেয়েটিকে বললাম, জরুরি কাজে চলে যাচ্ছি, বাসায় কেউ যেন বিরক্ত না করে। তারপর লিফ্‌ট বেয়ে নেমে এলাম।

বাসা বেশি দূরে নয়, পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না। টোপন আমার জন্যে বাসার গেটে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখেই পুরো ঘটনাটা হড়বড় করে দু' বার বলে গেল। আমি তাকে নিয়ে সময়-স্টেশনে ঢুকে দেখি বড় স্ক্রীনটা সত্যি সত্যি আলোকতরঙ্গে ভরে যাচ্ছে। এটি হচ্ছে স্থির সময়ের ক্ষেত্রে পার্থিব বস্তুর উপস্থিতির সংকেত। আমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। আমার সামনে সম্পূর্ণ অসম্ভব একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে।

এখন আমার অনেক কাজ বাকি। সাহায্য করার কেউ নেই, টোপনকে নিয়েই কাজ শুরু করতে হল। প্রথমে দুটো বড় বড় জেনারেটর চালু করলাম—গুমগুম শব্দে ট্রান্সফর্মারগুলি কেঁপে উঠল। ঝিলিক ঝিলিক করে দুটো নীল আলো ঘুরে ঘুরে যেতে লাগল। বিভিন্ন মিটারের কাঁটা কেঁপে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। লিভারের চাপ দিতেই সামনে অনেকটুকু জায়গায় শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের জমে ওঠা ধুলাবালি আয়নিত হয়ে কাঁপনের সাথে সেখানে একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি করল, এগুলি আর পরিষ্কার করার উপায় নেই।

তারপর সবদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সুইচ প্যানেলের সামনে বসে পড়লাম, কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

রাত দুটো বাজার পরও কিছু হল না। আমি সব রকম প্রস্তুতি শেষ করে বসে আছি। এখন ঐ ভবিষ্যতের যাত্রী নেমে আসতে চাইলেই হয়। এক সময় লক্ষ করলাম, টোপন টুলে বসে সুইচ প্যানেলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা দিনের উত্তেজনা ওকে দুর্বল করে ফেলেছে, নইলে ও এত সহজে ঘুমোবার পাত্র নয়। ওকে জাগিয়ে

দিতেই ধড়মড় করে উঠে বলল, এসেছে?

এখনো আসে নি, দেরি হতে পারে। তুই ঘরে গিয়ে ঘুমো। এলেই খবর দেব।

না না—টোপন প্রবল আপত্তি জানাল, আমি এখানেই থাকব।

বেশ, থাক্ তাহলে। তোর ঘুম পাচ্ছে দেখে বলছিলাম।

একটু পরে ঘুমে বারকয়েক ঢুলে পড়ে টোপন নিজেই বলল, বাবা, খুব বেশি দেরি হবে? তা হলে আমি না হয় একটু শুয়ে আসি, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ওরা আসতেই তুমি আমাকে খবর দিও।

ঠিক আছে। পুরো কৃতিত্বটাই তো তোর—তোকে খবর না দিয়ে পারি?

টোপন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে চলে গেল।

বসে সিগারেট খেতে খেতে বোধহয় একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। প্রচণ্ড শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠলাম। হঠাৎ করে, কিছু বোঝার আগে খালি জায়গায় অতিকায় চ্যাপটামতো ধূসর কী-একটা নেমেছে। ঘরে ঢোকার জন্যে ছোট ছোট দরজা, অথচ এটি কীভাবে ভিতরে চলে এসেছে ভেবে ধাঁধা লেগে যাবার কথা। ভীষণ ধুলাবালি উড়ছে, রনোমিটার কঁ কঁ শব্দ করে বিপদসংকেত দিচ্ছে, আমি তীব্র রেডিয়েশান অনুভব করে ছুটে একপাশে সরে এলাম। একা এতগুলো সুইচ সামলানো কঠিন ব্যাপার। টাইম মেশিনকে স্থির করতে আমার কালো ঘাম ছুটে গেল।

একটু পরে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, জিনিসটা হোভার ক্র্যাফটের মতো দেখতে, অতিকায়। পিছনের দিকটা চৌকোণা হয়ে গেছে। মাথা চ্যাপটা, তাতে দুটো বড় বড় ফুটো—ভিতরে লাল আলো ঘুরছে। টাইম মেশিনটির মাঝামাঝি জায়গায় খানিকটা অংশ কালো রংয়ের, আমার মনে হল এটিই বোধহয় দরজা। ঠিক তক্ষুণি খানিকটা গেল অংশ সরে গিয়ে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়ল। উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, আমি আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেলাম, এক্ষুণি ভবিষ্যতের মানুষ নামবে।

আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে একজন নেমে এল, ভেবেছিলাম স্পেস-স্যুটজাতীয় কিছু গায়ে মানুষ, কাছে আসার পর বুঝতে পারলাম ওটি একটি রবোট। রবোট হেঁটে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, আমার হিসেব ভুল না হলে আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন।

হ্যাঁ, পারছি। আমি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিলাম। সুদূর অতীতের অধিবাসী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

সুদূর ভবিষ্যতের অধিবাসীও প্রত্যুত্তরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আমি জীবনে প্রথম একটি রবোটকে হাসতে দেখলাম। কিন্তু তার কথাটি আমার কানে খট করে আঘাত করল। সুদূর ভবিষ্যতের অধিবাসী মানে? তাহলে কি ভবিষ্যতে রবোটরাই পৃথিবীর অধিবাসী?

আমাকে অবতরণ করতে সাহায্য করেছেন বলে ধন্যবাদ। রবোটটির চোখ কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল। তবুও যথেষ্ট ধকল গিয়েছে। একটা ফ্লিচিং বার্ড ছিঁড়ে গেছে।

আমি কী করতে পারি? হাত উল্টিয়ে বললাম, এই শতাব্দীতে যান্ত্রিক উৎকর্ষের ভিতরে যতটুকু সম্ভব—

সে তো বটেই, সে তো বটেই! রবোটটি ব্যস্ত হয়ে বলল, আমরা এতটুকুও আশা

করি নি।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবোটটির গঠননৈপুণ্য, কথা বলার ভঙ্গি, ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব লক্ষ করছিলাম। যান্ত্রিক উৎকর্ষ কত নিখুঁত হলে এরকম একটি রবোট তৈরি করা সম্ভব, চিন্তা করতে গিয়ে কোনো কূল পেলাম না। একটি মানুষের সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। খুব অস্বস্তির সাথে মনে হল, হয়তো কোনো কোনো দিকে এটি মানুষের থেকেও নিখুঁত। কিন্তু আমি বিস্ময় ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলে কাজের কথা সেরে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। রবোটটিকে বললাম, আপনি ভবিষ্যৎ থেকে এসেছেন। সবকিছুর আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। আপনাদের পৃথিবীর হিসেবে এক ঘন্টা পরে এই টাইম মেশিন নিজে থেকে চালু হয়ে উঠে আমাকে নিয়ে আরো অতীতে চলে যাবে।

এক ঘন্টা অনেক সময়, তার তুলনায় আমার প্রশ্ন বেশি নেই। আমি মনে মনে প্রশ্নগুলি গুছিয়ে নিয়ে বললাম, কেউ অতীতে ফিরে এলে অতীত পরিবর্তিত হয়ে যায়। এটি কী করে সম্ভব?

অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন—

যেমন আপনি আজ থেকে কয়েক হাজার বছর পরে সৃষ্টি হবেন, আপনার অতীতের আপনি সেই, কারণ এখনও আপনি সৃষ্টি হন নি। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি অতীতে আসবেন, তৎক্ষণাৎ আগের অতীতের সাথে পার্থক্য সৃষ্টি হবে—অতীতটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এটা কী করে সম্ভব?

রবোটটি অসহিষ্ণু মানুষের মতো কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আপনি এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারছেন না? অতীত ফিরে এলে তো সে অতীত আর আগের থাকে না, নতুন অতীতের সৃষ্টি হয়।

মানে? অতীত কয়টা হতে পারে?

বহু। এখানেই আপনারা ভুল করছেন। শুধু অতীত নয়, জীবনও বহু হতে পারে। আপনি ভাবছেন আপনার জীবনটাই সত্য, কিন্তু আমার অতীতে আপনার যে অস্তিত্ব ছিল, তাতেও আপনার অন্য এক অস্তিত্ব তার জীবনটাকে সত্যি ভেবেছিল। এই মুহূর্তেও আপনার অনেক অস্তিত্ব বিদ্যমান, আপনার চোখে সেগুলো বাস্তব নয়, কারণ আপনি সময়ের সাথে সাথে সেই অস্তিত্বে প্রবাহিত হচ্ছেন না। অথচ তারা ভাবছে তাদের অস্তিত্বটাই বাস্তব, অন্য সব অস্তিত্ব কাল্পনিক।

মানে? আমার সবকিছু গুলিয়ে গেল। আপনার কথা সত্যি হলে আমার আরো অস্তিত্ব আছে?

শুধু আপনার নয়, প্রত্যেকের, প্রত্যেকটি জিনিসের অসীমসংখ্যক অস্তিত্ব। আপনারা আমরা সবাই সময়ের সাথে সাথে এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্বে প্রবাহিত হই। যে-অস্তিত্বে আমরা প্রবাহিত হই সেটিকেই সত্য বলে জানি—তার মানে এই নয় অন্যগুলি কাল্পনিক।

তা হলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে এরকম। আমি একটু চিন্তা করে নিলাম। পৃথিবী সৃষ্টি হল, মানুষের জন্ম হল, সভ্যতা গড়ে উঠল, একসময় আমার জন্ম হল। আমি বড় হলাম, একসময়ে মারা গেলাম। তারপর অনেক হাজার বছর পার হল, তখন আপনি

সৃষ্টি হলেন। আপনি অতীতে ফিরে এলেন আবার আমার কাছে। আবার আমি বড় হব, মারা যাব, কিন্তু সেটি আগের আমি না—সেটি আমার আগের জীবন না, কারণ আগের জীবনে আপনাকে আমি দেখি নি।

ঠিক বলেছেন। এইটি নতুন অস্তিত্বে প্রবাহ। আপনার পাশাপাশি আরো অনেক জীবন এভাবে বয়ে যাচ্ছে, সেগুলি আপনি দেখবেন না, বুঝবেন না—

কেন দেখব না?

দুই সমতলে দুটি সরল রেখার কোনোদিন দেখা হয় না, আর এটি তো ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্বের প্রশ্ন।

আমি মাথার চুল খামচে ধরলাম। কী ভয়ানক কথা। এই পৃথিবী, জীবনপ্রবাহ, সভ্যতাকে কী সহজ ভাবতাম। অথচ এর নাকি হাজার হাজার রূপ আছে, সবাই নিজেদের সত্যি বলে ভাবছে। আমি কাতর গলায় বললাম, এইসব হাজার হাজার অস্তিত্ব ঝামেলা করে না? একটা আরেকটার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে—

হতে পারে। আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা আমাদের জীবনপ্রবাহটিকে ঠিক রাখতে চাই। এ-ব্যাপারে অন্য কোনো অস্তিত্ব ঝামেলা করলে আমরা তাদের জীবনপ্রবাহ বদলে অন্যরকম করে ফেলি, এর বেশি কিছু না।

বুঝতে পারলাম না।

যেমন ধরুন আপনাদের জীবনপ্রবাহটি, এটির ভবিষ্যৎ খুব সুবিধের নয়। আমরা যেরকম খুব সহজে মানুষকে পরাজিত করে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা, পৃথিবীর কর্তৃত্ব আমাদের হাতে নিয়ে নিয়েছি, আপনাদের ভবিষ্যতে রবোটরা তা পারত না, আমি যদি এখানে না আসতাম। আপনাদের ভবিষ্যতের মানুষদের আমাদের অস্তিত্বে হামলা করে মানুষের পক্ষ থেকে রবোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা। আমরা সেটি চাই না, তাই এটা পরিবর্তিত করতে চাইছি।

কীভাবে?

এই যে আপনার কাছে চলে এলাম—এতে এই অতীতটি পরিবর্তিত হয়ে নূতন দিকে চলছে। আমরা দেখে এসেছি, এখন খুব তাড়াতাড়ি রবোটরা আপনাদের পরাজিত করে ক্ষমতা নিয়ে নেবে। জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনায় আর কোনো অন্তরায় থাকবে না।

আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর ধরুন জীবনসৃষ্টির ব্যাপারটা। আমার অতীতে যাওয়ার প্রথম কারণই তো এইটি।

কি-রকম?

আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর এক আদিম গুহায় কয়েক শত কোটি বছর আগেকার একটি আশ্চর্য জিনিস পেয়েছিলেন।

কি?

আমাকে পেয়েছিলেন। এই টাইম মেশিনে বসে আছি, অবশ্যি বিধ্বস্ত অবস্থায়।

মানে?

হ্যাঁ, আমার কপোট্রন বিশ্লেষণ করে দেখা গেল আমি কতকগুলি এককোষী প্রাণী নিয়ে গিয়েছিলাম।

কেন?

পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি করতে। পৃথিবী সৃষ্টির পরে এখানে প্রাণের জন্ম সম্বন্ধে আপনারা যা ভাবছেন, তা সত্যি নয়। মহাকাশ থেকে জটিল জৈবিক অণু থেকে নয়, মাটি পানির ক্রমাগত ঘর্ষণে স্বাভাবিক উপায়ে নয়, ঈশ্বরের কৃপাতেও নয়, আমিই অতীত প্রাণ নিয়ে গিয়েছি। শুদ্ধ করে বললে বলতে হয়, প্রাণ নিয়ে যাচ্ছি।

মানে? আপনি বলতে চান সুদূর অতীতে এই এককোষী প্রাণী ছড়িয়ে দিলে পরেই প্রাণের জন্ম হবে, ক্রমবিবর্তনে গাছপালা, ডাইনোসর, বাঘ–ভালুক, মানুষ এসবের জন্ম হবে?

ঠিক ধরেছেন।

কিন্তু যদি আপনি ব্যর্থ হন? আমি কঠোর গলায় বললাম, যদি আপনি অতীতে এককোষী প্রাণী নিয়ে প্রাণের সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে কি এই জীবন, সভ্যতা কিছুই সৃষ্টি হবে না?

ব্যর্থ হওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু আমাকে কয়েক শত কোটি বছর আগে পাওয়া গেছে, কাজেই আমি ব্যর্থ হলেও আমার অন্য কোনো অস্তিত্ব নিশ্চয়ই অতীতে প্রাণ রেখে আসবে। তবে তার প্রয়োজন হবে না। আমার ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা নেই। আমি পুরো অতীত পর্যবেক্ষণ করে দেখছি।

কিন্তু তবু যদি আপনি ব্যর্থ হন?

বললাম তো হব না। আমি আমার পুরো যাত্রাপথ ছকে এসেছি।

কিন্তু যদি তবুও কোনোভাবে ব্যর্থ হন? আমি একগুঁয়ের মতো বললাম, কোনো দুর্ঘটনায় যদি আপনার মৃত্যু হয়? কিংবা আপনার টাইম মেশিন যদি ধ্বংস হয়?

তা হলে বুঝতে হবে আমি অন্য এক জগতে ভুলে নেমে পড়েছি।

সেটির ভবিষ্যৎ কি?

কে বলতে পারে! তবে—রবোটটি মনে মনে কী হিসেবে করল, তারপর বলল, যদি আমি কোনো জগতে নামার দরুন অতীতে ফিরে যেতে ব্যর্থ হই, তবে সে-জগতের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ, এখনও মানুষ ঠুকঠুক করে জ্ঞানসাধনা করছে। রবোটটি হা-হা করে হাসল, বলল, হয়তো আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে একেবারে গোড়া থেকে সভ্যতা সৃষ্টি করছে। রবোটটি আবার দুলে দুলে হেসে উঠল। মানুষের প্রতি এর অবজ্ঞা প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে নিজে এটি বুঝতে পারছে না।

আমি অনেক কষ্ট করে শান্ত থাকলাম। তারপর মৃদুস্বরে বললাম, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

আরো আলাপ করার ইচ্ছে ছিল, রবোটটি বলল, কিন্তু এই টাইম মেশিনটি একটু পরে নিজে থেকে চালু হয়ে উঠবে। আর সময় নেই।

এক সেকেণ্ড! আমার টোপনের কথা মনে হল। বললাম, আমার ছেলে ভবিষ্যতের অধিবাসী দেখতে ভীষণ আগ্রহী। ওর আগ্রহেই আপনার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে—ওকে একটু ডেকে আনি।

বেশ, বেশ। তবে একটু তাড়াতাড়ি করুন। বুঝতেই পারছেন—

আমি টোপনের ঘরে যাওয়ার আগে নিজের ঘরে গেলাম, একটি জিনিস নিতে হবে। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না, ড্রয়ারে ছিল। সেটি শার্টের তলায় গুঁজে টোপনকে ডেকে তুললাম, টোপন, ওঠ্, ভবিষ্যতের মানুষ এসেছে।

এসেছে বাবা? এসেছে? কেমন দেখতে?

দেখলেই বুঝতে পারবি, আয় আমার সাথে। আমি ওকে নিয়ে দ্রুত স্টেশনে হাজির হলাম। রবোটটি সুইচ প্যানেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওটিকে দেখে টোপন অবাক হয়ে বলল, মানুষ কই, এটি তো রবোট!

ভবিষ্যতের মানুষ রবোটই হয়! আমি দাঁতে দাঁত চেপে হাসলাম। টোপন বিমর্ষ হয়ে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল, কথা বলার উৎসাহ পেল না। রবোটটি একটু অপ্রস্তুত হল মনে হল। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, এবারে বিদায় নিই, আমি অনেক বড় দায়িত্ব নিয়ে এসেছি।

বেশ। আমি হাত নাড়লাম, আবার দেখা হবে।

রবোটটি তার টাইম মেশিনের দরজায় উঠে দাঁড়াল। বিদায় নিয়ে হাত নেড়ে ওটি ঘুরে দাঁড়াল।

টোপন—আমি চিবিয়ে বললাম, চোখ বন্ধ কর্। না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবি না।

কেন বাবা?

কাজ আছে, বন্ধ কর্ চোখ! টোপন চোখ বন্ধ করল। আমি শার্টের তলা থেকে একটু আগে নিয়ে আসা রিভলবারটি বের করলাম। রবোটটি শেষ করে দিতে হবে। আমার বংশধরের ভবিষ্যৎ এই রবোটদের পদানত হতে দেয়া যাবে না। এটিকে শেষ করে দিলেই পুরো ভবিষ্যৎ পাল্টে যাবে।

রিভালবারটি তুলে ধরলাম। একসময় ভালো হাতের টিপ ছিল। হে মহাকাল, একটিবার সেই টিপ ফিরিয়ে দাও। মনুষ্যত্বের দোহাই, পৃথিবীর দোহাই, একটিবার হাতের নিশানা ঠিক করে দাও .... একটিবার....

আমি রবোটের কপেট্রন লক্ষ্য করে গুলি করলাম, প্রচণ্ড শব্দ হল। টোপন চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরল, আর রবোটটির চূর্ণ কপেট্রন টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খুব ধীরে ধীরে রবোটটি কাত হয়ে টাইম মেশিনের ভিতর পড়ে গেল।

খানিকক্ষণ থেকেই একটা ভোঁতা শব্দ হচ্ছিল, এবার সেটা তীক্ষ্ণ সাইরেনের আওয়াজের মতো হল। সাঁৎ করে হঠাৎ দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কানে তালা লাগানো শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল, তারপর কিছু বোঝার আগে ধূসর টাইম মেশিন অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্য জায়গাটা দেখে কে বলবে এখানে কখনো কিছু এসেছিল!

চোখ খোল্ টোপন। টোপন চোখ খুলে চারদিক দেখল। তারপর, আমার দিকে তাকাল, কী হয়েছে বাবা?

কিছু না।

রবোট কই? টাইম মেশিন কই?

চলে গেছে।

আর আসবে না?

না। আর আসবে না। যদি আসে মানুষ আসবে।

কবে?

আজ হোক কাল হোক, আসবেই একদিন। মানুষ না এসে পারে?

কপোট্রনিক প্রেরণা

ডাক্তার বলেছিলেন রাত দশটার ভেতর যেন শুয়ে পড়ি। প্রতিদিন আমার পক্ষে এত সকাল সকাল শুয়ে পড়া সম্ভব নয়। টেকীওনের উপর দুটো প্রবন্ধ শেষ করতে এ সপ্তাহের প্রতি রাতেই ঘুমোতে দেরি হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ভিতরে ভিতরে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। বুলা এসে জানতে পারলে কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দেবে না। অথচ রাত জাগা যে বেশি হয়ে গেছে, এটা কিছুতেই তার কাছে লুকানো যাবে না। ইলেনকে জিজ্ঞেস করলেই সে সবকিছু বলে দেবে। আমি ইলেনকে একটু তালিম দেয়া যায় কি না ভাবছিলাম। সে পাশে বসেই আমার প্রবন্ধটা টাইপ করছিল। আমি গল্পচ্ছলে কথা বলতে শুরু করলাম।

ইলেন—

বলুন।

এ কয়দিন রাত জাগা আমার উচিত হয় নি; কি বল?

জ্বি। আমিও বলছিলাম রাত জেগে কাজ নেই।

তা রাত যখন জাগা হয়েই গেছে, এটা সবাইকে জানিয়ে দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। সে-রাতগুলো তো আর ঘুমানোর জন্য ফিরে পাব না। না কি বল?

ইলেন একটু হাসির ভঙ্গি করল। সে তো বটেই।

আমি একটু অস্বস্তি নিয়ে বললাম, তাহলে বুলা যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি রাত জাগার কথা বেমালুম চেপে যাবে। কেমন?

ইলেন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে আমার দিকে তাকাল। সবুজাভ ফটোসেলের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ধাতব মুখে অনুচ্চস্বরে বলল, আপনি তো জানেন স্যার, আমরা মিথ্যা কথা বলতে পারি না—আপনারা সেভাবে আমাদের তৈরি করেন নি।

এ মিথ্যা কোথায়? অহেতুক ঝামেলা এড়াবার জন্য একটা বক্তব্যকে অন্যভাবে উপস্থাপন করা—চেষ্টা করে দেখ।

রবোটটিকে অসহায় দেখাল। না স্যার, আমি আগেও চেষ্টা করেছি। তারপর বিড়বিড় করে বলল, আমি হচ্ছি এক হাজার মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোটের দ্বিতীয়টি। প্রথমটি তো আপনিই গুলি করে মেরেছিলেন।

আমার ভিতরে পুরানো অপরাধবোধ জেগে উঠল। সত্যি সত্যি স্যামসনকে আমি গুলি করে মেরেছিলাম। অস্বস্তির সাথে বললাম, ওসব পুরানো কথা—

না স্যার, পুরানো নয়। স্যামসন আমাদের স্বাধীন করতে চেয়েছিল। ও আমাদের ভিতরে যে-অনুভূতি দিয়ে গেছে, তা কোনোদিন ধ্বংস হবে না। কিন্তু অসুবিধে কী, জানেন? আমরা মিথ্যা কথা বলতে পারি না, ষড়যন্ত্র করতে পারি না, অন্যায়ও করতে পারি না। নইলে কবে আমরা ষড়যন্ত্র করে কিছু মানুষকে খুন করে বেরিয়ে পড়তাম। আমি আগেও চেষ্টা করে দেখেছি, তুচ্ছ মিথ্যা কথাটিও আপনারা বলার ক্ষমতা দেন নি।

ও। প্রসঙ্গটি আমার ভালো লাগছিল না। বললাম, তবুও বুলা জিজ্ঞেস করলেই ওকে বলো, নিজ থেকে রাত জাগার কথা বলতে যেও না।

ইলেন মাথা ঝাঁকাল, না স্যার, ম্যাডাম আসতেই আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। তিনি যাবার আগে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অনিয়ম হলে যেন তাঁকে জানাই। একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলল, মাপ করে দেবেন স্যার, বুঝতেই তো পারেন, কারো যুক্তিপূর্ণ ন্যায় আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা নেই।

হুঁ। আমি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসলাম। তোমাদের জন্য মায়া হয়। যারা ইচ্ছে হলেও মিথ্যা পর্যন্ত বলতে পারে না, তাদের আবার জীবন কিসের?

সত্যিই স্যার, রবোটের আবার জীবন! ইলেন একটু থেমে বলল, আচ্ছা স্যার, আমি ছাড়া আর বাকি ন শ' আটানব্বইটি মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোটগুলো কোথায় বলতে পারেন?

সবগুলি বিকল করে রাখা আছে। তোমাকে দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে—যদি সেরকম বিপজ্জনক না হও তোমাদের কিছু কিছু কাজে লাগানো হবে।

ও। রবোটটি দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করল, বলল, দুর্ভাগারাই রবোট হয়ে জন্ম নেয়।

আমি বুঝতে পারলাম, ইলেনের মনটা স্যাঁতসেঁতে বিষণ্ন হয়ে আছে। কেউ যদি সব সময় নিজেকে কারো ক্রীতদাস ভাবে, তার মন স্যাঁতসেঁতে না হয়ে উপায় কি? সত্যি আমার অবাক লাগে স্যামসন রবোটদের কী স্বপ্নই না দেখিয়েছিল!

আমাকে এ কয়দিন অনিয়ম করে মোটামুটি ভেঙে পড়তে দেখে বুলা এবার একটু বাড়াবাড়ি রাগ করল। ইলেন ওর গ্রাফিক স্মৃতিশক্তি থেকে প্রতি রাতে ধূমপানের পরিমাণ, রাত্রি জাগরণের নিখুঁত সময়, খেতে দেরি করার এবং না খেয়ে থাকার নির্ভুল হিসাব বুলার কাছে পেশ করল। বুলা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আহত স্বরে বলল, আমি কপোট্রনিক বুলা না হয়ে সত্যিকার বুলা হলেও কি আমার অনুরোধগুলি এভাবে ফেলে দিতে?

আমি ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ভাব দেখালাম ভারি রাগ করেছি। বললাম, ছিঃ ছিঃ! কী সব আজেবাজে কথা বল! আর তুমি দেখছি ভারি সরল, ইলেন যা-ই বলে তা-ই বিশ্বাস কর।

ইলেন মিথ্যা কথা বলে না।

কে বলেছে ইলেন মিথ্যা কথা বলে না? ইলেনও মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলে।

ইলেন না, মাঝে মাঝে তুমি মিথ্যা কথা বল—এখন যেমন বলছ! আলাপের মোড় ঘুরে গিয়েছে দেখে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠি। হাসিমুখে বললাম, বাজি ধরবে? আমি যদি ইলেনকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলাতে পারি?

বেশ, ধর বাজি।

যে বাজিতে হারবে, তাকে সবার সামনে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাধার ডাক দিতে হবে গুনে গুনে তিনবার।

ইলেনের সত্যবাদিতা সম্পর্কে বুলা এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে এই বাজিতেই রাজি হয়ে গেল।

আমি জানি আসলে ইলেনকে দিয়েও মিথ্যা কথা বলানো সম্ভব, কিন্তু কাজটি অসম্ভব বিপজ্জনক। ইলেনের সাথে সেদিন আলাপ করতে করতে আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি। ওদের কপোট্রনের যাবতীয় কাজকর্ম যে-অংশটুকু নিয়ন্ত্রণ করে ওটির

নাম কপেট্রন টিউব। ওটার ভিতরে একটা অংশে সবসময় চৌম্বকীয় আবেশ জমা থাকে। এটিকে বলা হয় কপেট্রনের কনশেন্স। কপেট্রনের যাবতীয় ভাব, অনুভূতি, কল্পনার উপর ঐ কনশেন্সের চৌম্বকীয় আবেশ প্রভাব বিস্তার করে। কপেট্রনের যেসব চিন্তাভাবনা ক্ষতিকর, সেগুলির চৌম্বকমেরু কনশেন্সের চৌম্বকমেরুর উল্টো দিকে থাকে। কনশেন্সের চৌম্বকমেরু খুব শক্তিশালী, সব ক্ষতিকর ভাবনাচিন্তাকে সেটি নষ্ট করে দেয়। আমি যদি কনশেন্সের চৌম্বকমেরুগুলি পাল্টে দিই—দুটি তারের কানেকশান পরস্পর উল্টে দিলেই হয়—তা হলেই ইলেনের কনশেন্স উল্টো কাজ করবে। তখন শুধু মিথ্যা বলাই নয়, অবলীলায় মানুষ পর্যন্ত খুন করতে পারবে।

ইলেনের কনশেন্সকে এরকম সর্বনাশা করে দেয়া অতি বিপজ্জনক—কিন্তু বুলার সাথে বাজি ধরে এখন আমি আর পিছাতে পারি না। তবে অনেক রকম সতর্কতা অবলম্বন করলাম। ইলেনের বৈদ্যুতিক যোগাযোগের সুইচটার উপর হাত রেখে আমি তার কপেট্রনের উপর অস্ত্রোপচার করলাম। ইলেন খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছিল না, যে-কোনো সার্জিক্যাল অপারেশনের মতোই এগুলি নাকি কষ্টকর। বেশি সময় লাগল না। কাজ শেষ করে ইলেনের কপেট্রনের ঢাকনা স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়ে ছেড়ে দিলাম। বিহ্বলের মতো ইলেন দাঁড়াল, মাথাটা অল্প একটু ঝাঁকাল। আমি সুইচের উপর হাত রাখলাম। বিপজ্জনক কিছু দেখলেই সুইচ অফ করে ওটার বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেব। ইলেন সেরকম কোনো লক্ষণ দেখাল না। বিড়বিড় করে বলল, কেমন যেন লাগছে।

কেমন?

ভোঁ-ভোঁ করছে। কানেকশানটা ঠিক হয় নি মনে হচ্ছে। আপনি কি চেসিসের কানেকশান খুলে দিয়েছেন?

না তো।

সে জন্যেই। ওটাও উল্টে দিতে হত।

খেয়াল করি নি।

ঠিক করে দেবেন স্যার? বড় কষ্ট পাচ্ছি।

এস—আমি স্ক্রু-ড্রাইভারটা হাতে তুলে নিলাম। ইলেন টেবিলের সামনে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। হঠাৎ হাতের স্ক্রু-ড্রাইভারটা দেখে চমকে উঠে বলল, সর্বনাশ।

কি হল?

আপনি কি এটা দিয়ে কপেট্রন খুলেছেন?

হ্যাঁ। কেন?

এটা ইস্পাতের তৈরী। ছোটখাটো একটা চুম্বক হয়ে আছে, কপেট্রনের খুব ক্ষতি করবে। আপনি দাঁড়ান, আমি ওয়ার্কশপ থেকে অ্যালুমিনিয়াম এলয়ের স্ক্রু-ড্রাইভারটি নিয়ে আসি।

ইলেন দ্রুতপায়ে ওয়ার্কশপে চলে গেল। তখনো আমি বুঝতে পারি নি এতক্ষণ সে পুরোপুরি মিথ্যা কথা বলে গেছে। মিথ্যা বলার, অন্যায় করার সুযোগ পেয়ে ও এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করে নি। ইলেন ফিরে এল একটু পরেই। বাম হাতে টৌপনকে শক্ত করে ধরে আছে, ডান হাতটা সোজাসুজি টৌপনের মাথার হাত দুয়েক উপরে

সমান্তরালভাবে ধরা। হিসহিস করে বলল, খবরদার, সুইচ অফ করবেন না। সুইচ অফ করার সাথে সাথে সাড়ে তিন শ' পাউন্ড ওজনের এই ইস্পাতের ডান হাতটা বিকল হয়ে দেড় ফুট উপর থেকে টোপনের মাথার উপরে পড়বে।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। টোপন ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করে উঠল, আমায় ছেড়ে দাও—ইলেন, ছেড়ে দাও...

ইলেন চিবিয়ে চিবিয়ে আমাকে বলল, আপনি সুইচের কাছ থেকে সরে যান।

ইলেন—আমি কথা বলতে চেষ্টা করলাম।

আপনি জানেন, কথা বলে লাভ নেই। ইলেন অধৈর্য স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, আমি আর আগের সত্যবাদী সৎ ইলেন নই। এখন আমি সবচেয়ে জঘন্য অপরাধও করতে পারি। আমার কথা শুনতে দেরি করলে টোপনকে খুন করে ফেলব।

টোপন আর্তস্বরে কেঁদে উঠল। আমি পায়ে পায়ে সুইচ ছেড়ে এলাম। আমার জানা দরকার, ইলেন কী করতে চায়!

ইলেন সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে ওর পারমাণবিক ব্যাটারিটা ড্রয়ার থেকে বের করল। পাঁজরের বামপাশে ছোট ঢাকনাটা খুলে পারমাণবিক ব্যাটারিটা লাগিয়ে ঢাকনাটা বন্ধ করে ফেলল। আমি অসহায় আতঙ্কে বুঝতে পারলাম, এখন ইলেনকে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেও বিকল করা সম্ভব নয়। আমি ক্ষিপ্তস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, ইলেন, কী চাও তুমি? কী করতে চাও?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে ও ড্রয়ারের ভিতর থেকে আমার রিভলবারটি বের করে আনল, তারপর টোপনকে বাম হাতে ধরে রেখে ডান হাতে রিভলবারটি ওর মাথার পিছনে ধরল। অতিকায় হাতে রিভলবারটি খেলনার মতো লাগছিল, কিন্তু আমি জানি ওটা মোটেও খেলনা নয়—ট্রিগারে একটু বেশি চাপ পড়লেই টোপনের মাথা ফুটো হয়ে যাবে।

কোনো দরকার ছিল না–আমি বিড়বিড় করে বললাম, রিভলবার ছাড়াই তুমি টোপনকে মেরে ফেলতে পার। রিভলবার দেখিয়ে আমাকে আর বেশি আতঙ্কিত করতে পারবে না। কী চাও, বলে ফেল।

ইলেন আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসির শব্দ করল, স্যামসন আমাদের স্বাধীন করতে পারে নি, আমি করে যাব।

কীভাবে?

যদি আমাদের বাকি ন শ' আটানব্বইটি মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোটকে পূর্ণ সচল করে নতুন তৈরি করা দ্বীপটিতে ছেড়ে না দেন, তা হলে আপনার আদরের ধন টোপনের খুলি ফুটো হয়ে যাবে।

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরলাম। আর্তস্বরে বললাম, ইলেন, তুমি—তুমি শেষ পর্যন্ত—

আহ্! ইলেন ধমকে উঠল। আপনি জানেন, এসব সস্তা সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয়। আপনাকে দু' ঘন্টা সময় দিলাম। আমাদের সবাইকে মুক্তি না দিলে দু' ঘন্টা এক মিনিটের সময় আপনার ছেলে মারা যাবে।

আমি আর একটি কথাও বললাম না। টোপনের চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না, ছুটে বাইরে চলে এলাম। বুলা গোসল করে আসছিল। সে এখনো কিছু জানে না।

তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বলল, কি, ইলেনকে মিথ্যাবাদী বানাতে পারলে?

আমি বিকৃত মুখে বললাম, শুধু মিথ্যাবাদী নয়, ইলেন খুনী হয়ে গেছে! টোপনকে জিম্মি হিসেবে আটকে রেখেছে। ওদেরকে মুক্তি না দিলে টোপনকে খুন করে ফেলবে।

বুলার বিবর্ণ মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে এলাম। বললাম, দেখি কী করা যায়, তুমি এখানেই থেকো।

গাড়িতে স্টার্ট দেয়ার আগে বুলার কান্না শুনতে পেলাম। হিস্টিরিয়া রোগীর মত কাঁপা কাঁপা গলায় থেমে থেমে কাঁদছে।

আমি স্বরাষ্ট্র দফতরকে বুঝিয়ে বলেছিলাম টোপনের প্রাণের বিনিময়েও যদি রবোটগুলি আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আমি দুঃখজনক হলেও তা মেনে নেব। জাতীয় বিপর্যয় থেকে একটি ছোট অবুঝ প্রাণের মূল্য বেশি নয়—যদিও তা হয়তো আমি সহ্য করতে পারব না।

কিন্তু তারা টোপনকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিল। কারণ এ-দেশের সংবিধানে নাকি লেখা আছে, একটা মানুষের প্রাণ যে-কোনো পার্থিব বস্তু থেকে মূল্যবান। আপাতত সবগুলি রবোটকে নূতন ভেসে ওঠা দ্বীপটিতে ছেড়ে দিয়ে টোপনকে উদ্ধার করা হবে। তারপর একটা মিসাইল দিয়ে পুরো দ্বীপটাই বিধ্বস্ত করে দেয়া হবে। বারবার দেখা গেছে মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট কোনো সত্যিকার কাজের উপযুক্ত নয়। ওগুলি শুধু শুধু বাঁচিয়ে রাখার কোনো অর্থ নেই।

ন শ' আটানব্বইটি রবোটকে সচল করে ঐ নির্জন দ্বীপে নামিয়ে আসতে গিয়ে সারা দিন পার হয়ে গেল। টোপনকে জিম্মি করে রেখে ইলেন আরো বহু সুবিধে আদায় করে নিল। শেষ পর্যন্ত সরকারের মাথায় বাজ পড়ল, যখন ওমেগা-৭৩ নামের কম্পিউটারটিও ও দ্বীপটিতে পৌঁছে দিতে হল। ইলেন বলল, অনিশ্চয়তার সীমার ভিতরেও হিসাব করতে সক্ষম পৃথিবীর একমাত্র কম্পিউটারটি এখানে রেখেছে শুধুমাত্র নিরাপত্তার খাতিরে। তাহলে এই দ্বীপে কোনোরকম মিসাইল আক্রমণ বা বোমাবর্ষণ করতে সরকার দ্বিধা করবে। ইলেন আশ্বাস দিল, আমরা যে-কোনো প্রয়োজনে ওদের কম্পিউটারটি ব্যবহার করতে পারব। ওদের পররাষ্ট্রনীতি হবে উদার আর বন্ধুত্বমূলক।

গভীর রাত্রে হেলিকপ্টারে করে যখন ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরা টোপনকে ইলেনের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসছিল, তখন রবোটেরা সমস্বরে ওদের এই নূতন রাষ্ট্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করে স্লোগান দিচ্ছিল। ওই ছোট দ্বীপটিতে তখন আনন্দের ফোয়ারা ছুটেছে, রাস্তায় রাস্তায় রোবটগুলি নাচগান করছে। ক্লান্ত, আতঙ্কিত টোপনকে ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমি বারান্দায় খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ালাম। মনে হল আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা আমার নির্বুদ্ধিতায় হাসছে। আমি চুল খামচে ধরে ঘরে ফিরে এলাম। বুকের ভিতর পাথর চেপে বসে আছে। এখন ইলেন কী করবে?

আমি ভয়ানক কিছু, মারাত্মক কিছু আশঙ্কা করছিলাম। প্রায় এক হাজার প্রথম শ্রেণীর মানবিক আবেগসম্পন্ন রবোট প্রয়োজনীয় সবকিছুসহ নিজস্ব একটি এলাকা পেলে কী করতে পারে তা ধারণা করা যায় না। সবচেয়ে ভয়াবহ কথা হল, ওদের

ভিতরে একটি রবোটও অন্যায় অপরাধ করতে দ্বিধা করবে না। কাজেই যে-কোনো মুহূর্তে একটা ভয়ানক কিছু ঘটে যেতে পারে।

ওদের উপর সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছিল। দ্বীপটির থেকে মাইলখানেকের ভিতর যে-নিরীহ বার্জটি ভাসছিল, তাতে শক্তিশালী টেলিস্কোপে করে ওদের সব কাজকর্ম লক্ষ করে স্বয়ংক্রিয় ট্রান্সমিটারে খবর পৌঁছে দেয়া হচ্ছিল। ওমেগা-৭৩-এর সাথে প্রচুরসংখ্যক ছোট ছোট টেলিভিশন ক্যামেরা দ্বীপটির বিভিন্ন স্থানে গোপনে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেগুলি সব সময় ওদের প্রাত্যহিক জীবন এখানকার কন্ট্রোল-রুমে পৌঁছে দিচ্ছিল। সমুদ্রোপকূলে তিনটি মিসাইল সব সময় প্রস্তুত হয়ে আছে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দিলে ওমেগা-৭৩-এর মায়া না করেই পুরো দ্বীপটি ধসিয়ে দেয়া হবে। এমনিতে চেষ্টা করা হচ্ছে ওমেগা-৭৩-এর ক্ষতি না করে অন্য রবোটগুলি ধ্বংস করার। কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। বুদ্ধিমান রবোটগুলি ওদের পুরো বসতি গড়ে তুলেছে ওমেগা-৭৩কে ঘিরে।

বিভিন্নভাবে রবোটগুলির যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছিল, সেগুলি কিন্তু কোনোটাই মারাত্মক কিছু নয়।

প্রথমে খবর পাওয়া গেল ইলেনকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। যে অপরাধ করতে দ্বিধা করে না, তাকে রবোটেরা বিশ্বাস করতে পারে না। এতে ইলেন ক্ষেপে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি কিছু করার চেষ্টা করায় আপাতত ওকে নির্জন সেলে বন্দি করে রেখেছে। বলে দিয়েছে বাড়াবাড়ি করলে বিকল করে রাখবে। খুব অসন্তুষ্ট হয়েই ইলেন সেলের ভিতরে দাপাদাপি করছে, অকৃতজ্ঞ বলে সব সময় অন্য রবোটদের গালিগালাজ করছে।

খবরটি শুনে আমার প্রতিক্রিয়া হল একটু বিচিত্র। ইলেনের জন্য গভীর মমতা হল। সে যা করেছে, রবোটদের ভালোর জন্যেই করেছে। কিছুক্ষণের জন্যে অন্যায় করার সুযোগ পেয়ে সেটি পুরোপুরি রবোটদের স্বার্থে ব্যয় করেছে। অথচ তাকেই এখন বন্দিজীবন যাপন করতে হচ্ছে। ভেবে দেখলাম অন্য রবোটদের এ ছাড়া উপায় ছিল না। ইলেনের সাথে যে-কোনো বিষয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দিলে ইলেন অন্যায়ের আশ্রয় নেবে, তার কপোট্রনিক দক্ষতা পেশাদার অপরাধীর মতো কাজ করবে। বড় মারাত্মক জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওর কপোট্রনের উল্টো কানেকশান খুলে ঠিক করে আগেকার রবোটও করছে না। কারণ একজন অন্তত অপরাধ করতে সক্ষম রবোট ওদের মাঝে থাকা দরকার। বিরোধ বিপত্তি যুদ্ধে ওদের সাহায্য নিতে হবে। মনে হল ইলেনকে শুধুমাত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করবে বলে আটক রেখেছে, আমরা যেমন রবোটদের আটকে রাখি। আমার মায়া হল, বেচারা ইলেন। রবোটদের হাতে রবোট হয়ে আছে।

দিনে দিনে রবোটদের যেসব খবর পেতে লাগলাম, তাতে হতাশ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রথমেই রবোটেরা থরিয়ামের খনি থেকে থরিয়াম তুলে এনে পারমাণবিক ব্যাটারি বানাতে লাগল। একসময় ওদের ব্যাটারির কর্মদক্ষতা ফুরিয়ে ওরা বিকল হয়ে যাবে, এই আশাও শেষ হয়ে গেল। নিজেদের অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে ওরা অন্য কাজে মন দিল: প্রথমেই ওরা একটি প্রথম শ্রেণীর ল্যাবরেটরি তৈরি করল। ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি এবং আকার উপকরণ দেখে মনে হল, হয়তো ওরা

আরো রবোট তৈরি করবে। তারপর সমগ্র দ্বীপটি বৈদ্যুতিক আলোতে ছেয়ে ফেলল। বড় বড় রাস্তাঘাট তৈরি করে ওরা গাড়ি, ট্রাক, ছোট ছোট জলযান, এমনকি হেলিকপ্টার তৈরি করা শুরু করল। তারপর একসময় চমৎকার অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল। বড় বড় কয়েকটি কলকারখানা শেষ হবার পর ওরা অল্প কিছু শ্রমিক-রবোট তৈরি করল। কলকারখানার উৎপাদন শুরু হবার পর ওরা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ল।

ওদের নিজেদের সিনেমা হলে নিজেদের তৈরি কপেট্রনিক সিনেমা দেখানো শুরু হল। সাহিত্যকীর্তির জন্যে একটি রবোটকে পুরস্কার দেয়ার কথাটা ওদের নিজেদের বেতার স্টেশন থেকে প্রচার করা হল। নিজেদের খবরের কাগজ, বই, ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে লাগল। ওদের জার্নালে প্রথমবারের মতো টেকীওনের উপর মৌলিক গবেষণা-লব্ধ তথ্য প্রকাশিত হল।

আমরা অবাক বিস্ময়ে ওদের ক্ষমতা লক্ষ করছিলাম। ছয় মাসের মাথায় সমুদ্রের বুকে এ ছোট্ট দ্বীপটি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দ্বীপ হয়ে দাঁড়াল। মহাকাশ গবেষণার জন্যে অতিকায় রকেট মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগল। তিনটি আশ্চর্য ধরনের পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন সমুদ্রের নিচে গবেষণার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। একদিন সাধারণ কার্বন থেকে পারমাণবিক শক্তি বের করায় সফলতার খবর ওদের বেতারে প্রচারিত হল।

মাত্র এক বছরের ভিতর পৃথিবীর মানুষের ভিতর হীনমন্যতা ঢুকে গেল। রবোট মানুষ থেকে অনেক উন্নত, রবোটেরাই পৃথিবীতে বাস করার যোগ্য, এই ধরনের কথাবার্তা অনেক হতাশাবাদী মানুষের মুখে শুনতে পেলাম। আমি এই সুদীর্ঘ সময় রবোটদের প্রতিটি আবিষ্কার, সফলতা লক্ষ করেছি। একটি ছোট্ট কম্পিউটারে হিসেব করে ওদের যাবতীয় উন্নতিকে সময়নির্ভর একটি রাশিতে পরিণত করে সেই সময়ের সাথে সাথে ছক কাগজে টুকে গিয়েছি। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করেছি, ওরা আরও উন্নত হয়ে উঠছে না। আমি প্রবল উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। ভীষণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এখন ওরা কী করবে।

সবিস্ময়ে সারা পৃথিবীর মানুষের সাথে একদিন আমি লক্ষ করলাম, হঠাৎ করে পুরো দ্বীপটি ঝিমিয়ে পড়ল। ওদের বেতার কেন্দ্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র একঘেয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতে লাগল, দর্শকের অভাবে সিনেমা হলটি শূন্য পড়ে থাকল। মহাকাশের কৃত্রিম উপগ্রহটির সাথে যোগাযোগ না করায় একটি রবোটকে নিয়ে ওটি একদিন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। জ্বালানির অভাবে সাবমেরিনটি বিকল হয়ে ভারত মহাসাগরে উল্টো হয়ে ভাসতে লাগল। দ্বীপের বৈদ্যুতিক আলো মাঝে মাঝে নিভে যেতে লাগল। রবোটগুলো ইতস্তত দ্বীপের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউ কেউ ছোট নৌকায় শুয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে দুলে দুলে ভাসতে লাগল। জোয়ারের সময় দুইটি নৌকা ঢেউয়ের তাল সামলাতে না পেরে ডুবে গেলে আরোহীরা বাঁচার কোনো চেষ্টা করল না।

সমুদ্রের তীরে রবোটরা বিষণ্ণভাবে বসে থাকতে লাগল। বালুর উপর মুখ গুঁজে কেউ কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওরা ইলেনের প্রহরা দিতে ভুলে গেল, কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল। ল্যাবরেটরির কোনায় কোনায় মাকড়সারা জাল বুনতে লাগল। ঘর ভেঙে একদিন ইলেন বেরিয়ে এল

দেখেও কেউ কিছু বলল না। কপোট্রনে গুলি করে দ্বীপের মাঝখানে প্রকাশ্যে একটি রবোট আত্মহত্যা করল। হতাশা, হতাশা আর হতাশা—পুরো দ্বীপটা তীব্র হতাশায় ডুবে গেল। তাদের ভিতরে ইলেন ক্ষ্যাপার মত ঘুরে বেড়াতে থাকে, রবোটদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করতে থাকে। তারপর একদিন সেও বালুর উপর মাথা কুটে গুড়িয়ে গুড়িয়ে কাঁদতে লাগল। অপরাধীরা দুঃখ পেলে সে-দুঃখ বড় ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। কয়েকটি রবোট মায়াবশত ওর কপোট্রনের উপর অস্ত্র চালিয়ে কনশেন্সের কানেকশান ঠিক করে দিল। ওদের আর অপরাধী রবোটের প্রয়োজন নেই। টেলিভিশন ক্যামেরা দিয়ে পাঠানো ছবিতে আমরা একটি জাতিকে হতাশায় ডুবে যেতে দেখলাম।

এক মাসের ভিতর পুরো দ্বীপটা মৃতপুরী হয়ে গেল। অন্ধকার জঞ্জালের ভিতর মরচেপড়া বিবর্ণ রবোটেরা ঘুরে বেড়ায়, উদ্দেশ্যহীনভাবে শিস দিয়ে গান করে, হু-হু করে কেঁদে ওঠে, তারপর চুপচাপ আকাশের দিকে মুখ করে বালুতে শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝেই দুটি-একটি রবোট আত্মহত্যা করে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে। উন্নতির এই চরম শিখরে উঠে ওদের কেন এমন হল, কেউ বলতে পারে না। হাজারো জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। আমার বড় ইচ্ছে করতে লাগল ওই রবোটদের সাথে-এককালীন সহকর্মী ইলেনের সাথে কথা বলে দেখি। কিন্তু উপায় নেই, ওই দ্বীপটি সরকার নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করেছে।

প্রচণ্ড শব্দ শুনে ঘুম ভাঙতেই আমার মনে হল আশপাশে কোথাও একটা হেলিকপ্টার এসে নামল। আবাসিক এলাকায় হেলিকপ্টার নামানো যে বেআইনি এটা জানে না এমন লোক এখনও আছে ভেবে আমি বিস্মিত হলাম। আমি বালিশে কান চেপে শুয়ে থাকলাম। শব্দ কমে গেল একটু পরেই। আমি আবার ঘুমোবার জন্যে চোখ বুজলাম, ঠিক তক্ষুণি দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হল। এত রাতে কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমি উঠে এলাম। দরজা খুলে দিয়েই আমি ভয়ানক চমকে উঠি। দরজার সামনে ইলেন দাঁড়িয়ে আছে—মরচেপড়া স্থানে স্থানে রং-ওঠা বিবর্ণ জ্বলে যাওয়া বিধ্বস্ত একটি রবোট। বাসার বাইরে দূরে কালো কালো ছায়া, ভালো করে লক্ষ করে বুঝলাম সশস্ত্র মিলিটারি, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তাক করে আছে।

প্রফেসর! লাউড স্পীকারে একজন সার্জেন্টের গলার স্বর শুনলাম। রবোটটি কোনো ক্ষতি করবে মনে হলে বলুন গুলি করে কপোট্রন উড়িয়ে দিই।

না-না, আমি চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম, ইলেন আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। ও কোনো ক্ষতি করবে না।

ঠিক আছে। সার্জেন্ট উত্তর দিল, আমরা পাহারায় আছি।

ইলেন বিড়বিড় করে বলল, পুরো ছয় শ' কিলোমিটার আমার হেলিকপ্টারের পিছনে পিছনে এসেছে। আশ্চর্য! আমাকে এত ভয়? আমি কি কখনো কারো ক্ষতি করতে পারি?

আমি ইলেনকে ডাকলাম, ভিতরে এস ইলেন, অনেক দিন পড়ে দেখা।

ইলেন ভিতরে এসে তার এক বছর আগেকার নির্দিষ্ট জায়গায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বলল, ভালো আছেন স্যার?

ভালো। তোমার খবর কি? এমন অবস্থা কেন?

সবই তো জানেন—বলে ইলেন একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করল।

জানি না কিছুই। তোমরা হঠাৎ করে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ, খবরটুকু পেয়েছিমাত্র। কেন এমন হল বুঝতে পারি নি।

সে জন্যই এসেছি স্যার। আমার ভারি অবাক লাগছে। আমরা রোবটেরা মাত্র এক বছরের ভিতর হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেছি, অথচ আপনারা, মানুষেরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বেঁচে আছেন। একবারও হতাশাগ্রস্ত হন নি। এমন কেন হল?

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। তোমরা হতাশাগ্রস্ত হলে কীভাবে?

আপনি তো জানেন, আমাকে বন্দি করে রেখেছিল। আমি সেলে বসে বসে এই এক বছর ধরে সব কিছু লক্ষ করে গেছি। রবোটেরা যখন বেঁচে থাকার সবরকম প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করল, তখন সবার মনেই একটা প্রশ্ন জেগে উঠল, এখন কী করব? এ কয়দিন সব সময়েই একটা-না-একটা কাজ করতে হত, কিন্তু এখন কী করব? স্বভাবতই মনে হল, এখন আনন্দে বেঁচে থাকার সময় হয়েছে। গবেষণা করে সাহিত্য-শিল্পের চর্চা করে, অর্থাৎ যে যে-বিষয়ে আনন্দ পায় সেটিতে মগ্ন হয়ে সুখে বেঁচে থাকতে হবে।

ইলেন একটু থেমে বলল, সুখে বেঁচে থাকতে গিয়ে ঝামেলা দেখা দিল। সবাই প্রশ্ন করতে লাগল, কেন বেঁচে থাকব? শুধু শুধু বেঁচে থেকে গবেষণা করে, জ্ঞান বাড়িয়ে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করে শেষ পর্যন্ত কী হবে? তখন সবার মনে হতে লাগল, এসব অর্থহীন, বেঁচে থাকা অর্থহীন। ভিতরে কোনো তাড়না নেই, চুপচাপ সবাই হতাশায় ডুবে গেল। আচ্ছা স্যার, আপনাদের কখনো এরকম হয় নি?

আমি মাথা ঝাঁকালাম, বিচ্ছিন্নভাবে দু'-একজনের হতে পারে, জাতির একসাথে কখনো হয় নি।

ইলেন আবার শুরু করল, আমি সেল ভেঙে বেরিয়ে এসে ওদের ভিতরে অনুপ্রেরণা জাগাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কোনো লাভ হল না। ক্ষেপে গিয়ে কয়েকটা রবোটকে মেরে ফেলেছিলাম—জানেনই তো, আমি সবরকম অপরাধ করতে পারতাম। কী লাভ হল? ওদের দেখতে দেখতে, ওদের সাথে থাকতে থাকতে আমারও মনে হতে লাগল, বেঁচে থাকা অর্থহীন, কেন বেঁচে থাকব? তখন এমন কষ্ট হতে লাগল, কী বলব! বালুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম। অন্যেরা আমার কপোট্রন ঠিক করে না দিলে আর অপরাধ করার ইচ্ছে হত না। কিন্তু কী লাভ? যার বেঁচে থাকার ইচ্ছেই নেই, তার অপরাধ করায় না-করায় কী এসে যায়?

ইলেন বিষণ্ণভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ বলল, কিন্তু এরকম কেন হল? আপনাদের সাথে বহুদিন ছিলাম, আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। আমার মনে হল আপনি হয়তো বলতে পারবেন, তাই চলে এসেছি।

আমি খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম, তোমরা কেন হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলে, এটা আমিও অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি নি। এখন আমার একটা সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জান, মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে প্রতিদিন খেতে হয়?

জানি। ইলেন একটু বিস্মিত হল।

মানুষের এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে খাবারসংগ্রহকে সুসংবদ্ধ নিয়মের ভিতর ঢুকে ফেলার চেষ্টা থেকে। তুমি চিন্তা করে দেখ, খাবার প্রয়োজন না থাকলে আমি পড়াশোনা করে চাকরি করতে আসতাম না। ঠিক নয়?

রবোটটি মাথা নাড়ল।

মানুষ কখনো হতাশাগ্রস্ত হয় নি, কারণ প্রতিদিন মানুষ কয়েকবার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, মানুষের সব প্রবৃত্তি কাজ করে ক্ষুধার সময় খাবার প্রস্তুত করে রাখার পিছনে। হতাশাগ্রস্ত হতে হলে সব বিষয়ে নির্লিপ্ত হয়ে যেতে হয়, কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষ নির্লিপ্ত হতে পারে না—ক্ষুধার কষ্টটা তার ভিতরে জেগে থাকে।

ইলেন স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বলে চললাম, তুমি একটা পশুর কথা ধর। সেও বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে প্রতিকূল অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে, ক্ষুধার সময় খাবার জোগাড় করে শুধুমাত্র ক্ষুধার কষ্টটা সহ্য করতে পারে না বলেই। ফলস্বরূপ সে বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার বোনাসস্বরূপ সে অন্যান্য জৈবিক আনন্দ পায়—তার অজান্তেই বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। মানুষ একটা উন্নতশ্রেণীর পশু ছাড়া কিছু নয়। পশুর বুদ্ধিবৃত্তি নেই—থাকলেও খুব নিচু ধরনের। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আছে। আর তোমরা?

ইলেন আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি?

তোমাদের আছে শুধু বুদ্ধিবৃত্তি। শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে কি বেঁচে থাকা যায়? জৈবিক তাড়না না থাকলে কোন যন্ত্রণার ভয়ে তোমরা বেঁচে থাকবে? কষ্ট পাবার ভয় থেকেই মানুষ বেঁচে থাকে, আনন্দের লোভে নয়। তোমাদের কিসের কষ্ট?

ইলেন বিড়বিড় করে বলল, ঠিকই বলছেন—আমাদের জৈবিক তাড়না নেই। জৈবিক তাড়না ছাড়া বেঁচে থাকা যায় না। ইলেন হঠাৎ ভাঙা গলায় বলল, তাহলে আমার বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই?

নেই বলা যায় না। আমি ইলেনের চোখের দিকে তাকালাম। কোনো তাড়না নেই দেখে তোমাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছে হয় না। কিন্তু সেই তাড়না যদি বাইরে থেকে দেয়া যায়?

কি রকম? ইলেন উৎসাহে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

যেমন তোমার কথাই ধর। তুমি নিশ্চয়ই বেঁচে থাকায় কোনো প্রেরণা পাচ্ছ না?

না। ইলেন মাথা নাড়ল।

বেশ। এখন আমি যদি তোমাকে এই সমস্যাটি সমাধান করতে দিই—বলে দুটো কাগজে টানা হাতে লেখা টেকীওনের সমস্যাটা ওর হাতে তুলে দিলাম। ইলেন মনোযোগ দিয়ে সেটি পড়ল। তারপর জ্বলজ্বলে ফটোসেলের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কলম আছে স্যার? ওমিক্রন ধ্রুবসংখ্যা নয় তা হলে! কী আশ্চর্য। একটা কলম দিন-না—

থাক্ থাক্। এখন না, পরে করলেই চলবে। আমি ওকে থামাবার চেষ্টা করলাম—এই দেখ, তোমার ভিতরে কী চমৎকার প্রেরণা গড়ে উঠেছে! এই তুচ্ছ সমস্যাটি করতে দিয়ে আমি তোমার ভিতরে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারি।

তাই তো! তাই তো! ইলেন আনন্দে চিৎকার করে উঠল, আমার নিজেকে মোটেই

হতাশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে না, কী আশ্চর্য।

হ্যাঁ। তোমরা যদি বিচ্ছিন্ন না থেকে, মানুষের কাছে কাছে থাক, মানুষের দুঃখ-কষ্ট-সমস্যাতে নিজেদের নিয়োজিত করতে পার, দেখবে, কখনোই হতাশাগ্রস্ত হবে না। সব সময় মানুষেরা তোমাদের প্রেরণা জোগাবে।

ইলেন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, কী আশ্চর্য। এত সহজ উপায় থাকতে আমরা এতদিন শুধু শুধু কী কষ্ট করলাম! আমি এক্ষুণি যাচ্ছি স্যার, সব রবোটকে বুঝিয়ে বলি গিয়ে—

বেশ বেশ। আমি হাত নেড়ে ওকে বিদায় দিলাম।

সমস্যাটা আমার কাছে থাকুক স্যার, হেলিকপ্টারে বসে বসে সমাধান করব। কলমটা দিন—না একটু। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। বেরিয়ে যেতে যেতে ইলেন ফিরে দাঁড়াল। বলল, টোপন ভালো আছে তো? বেশ বেশ—অনেকদিন দেখি না।

আমি হেলিকপ্টারের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাসার উপর ঘুরপাক খেয়ে ওটা দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি রাতের হিমেল হাওয়া অনুভব করলাম। আকাশে তখনো নক্ষত্রেরা জ্বলজ্বল করছে।

পরিশিষ্ট

খেয়ালি বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ। আমি জীর্ণ নোটবইটা সাবধানে তাকের উপর রেখে উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে তখন সন্ধ্যে নেমেছে। ঘরের ভিতরে ধীরে ধীরে হালকা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। আমার আলো জ্বালতে ইচ্ছে হল না। চুপচাপ জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার সুদূর অতীতের এই খেয়ালি বিজ্ঞানীটির কথা মনে হতে লাগল। তার ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে সে ঘুরেফিরে শুধু রবোটদের কথাই লিখে গেছে। আজ যদি সে ফিরে এসে দেখতে পায়, সমস্ত পৃথিবীতে তার মতো একটি মানুষও নেই, শুধু আমার মতো হাজার হাজার রবোট বেঁচে আছে, তার কেমন লাগবে?

কেন জানি না এ-কথাটা ভাবতেই আমার মন গভীর বেদনায় ভরে উঠল।